শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আলোয় ছায়ায়

ধূলিধূসর প্রাত্যহিকতা থেকে অনেক দূরে, রিখিয়ার স্তব্ধ নির্জনতায় ছবি আঁকার জগতে একাকী জীবনযাপন করছিলেন যে-শিল্পী, তাঁর হৃদয়ে জন্ম নিল এক অদ্ভুত প্রতিহিংসার নীলাভ আগুন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কলমে সেই অগ্নিসঞ্জাত তীব্র দহনের কাহিনী।

গোয়েন্দা পুলিশ অফিসার শবরের মুখ থেকে খবরটা শুনে শিল্পী সর্বজিৎ সরকার স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁরই স্ত্রী ও দুই কন্যার দশটি বিভিন্ন ন্যুড ছবি কলকাতার একটি প্রদর্শনীতে দেখানো হচ্ছে। কে আঁকল এই সিরিজ ? যদিও তাঁর পারিবারিক জীবন বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, তবু স্বামী ও পিতা হিসেবে এ-কাজ করা সর্বজিতের পক্ষে অসম্ভব। তিনি সে-কথা জোর দিয়ে ঘোষণাও করলেন। তাহলে কোন্ সে শিল্পী ? অবশ্য স্ত্রী ইরার দৃঢ় বিশ্বাস, প্রতিহিংসাপরায়ণ সর্বজিৎই এমন বিকৃত পথ বেছে নিয়ে তাদের হেয় করতে চেয়েছেন। আর্ট কালেকটার সিংঘানিয়া ও চিত্র-সমালোচকদের ধারণা, ছবিগুলো সর্বজিতেরই আঁকা। হঠাৎ সিংঘানিয়া খুন হয়ে গেলেন। শবর আবার এল রিখিয়ায়। সেখানে রহস্যের পর্দা উঠল এক অবিশ্বাস্য চমকে। টানটান এই উপন্যাসে চিত্রিত জীবনের উল্টো পিঠের দুরন্ত ছবি।

ISBN 81-7215-676-6

আলোয় ছায়ায়

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৭ মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ মে ১৯৯৭ মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০

ISBN 81-7215-676-6

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৪৫·০০

"রা-স্বা"

শ্রী দেবাশিস মিত্র
শ্রীমতী উমা মিত্র
করকমলেষু

একেই বলে লোনলিনেস। বুঝলে। অ্যাবসোলিউট লোনলিনেস।

একা থাকতে আপনার ভাল লাগে কি ?

কখনও লাগে। কখনও লাগে না। এনিওয়ে, আই হ্যাভ টু বিয়ার ইট।

কেন, আপনার তো সবাই আছে ?

আছে নাকি ?

স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, এমন কি মা অবধি।

সেটা আছে। তবু কেউ নেই।

আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।

বুঝবার দরকারই বা কী ? একজনের ব্যক্তিগত প্রবলেম অন্যে সব সময়ে বুঝতে পারেও না।

প্রবলেমটা কি সর্ট আউট করা যায় না ?

যায়। পৃথিবীর সব প্রবলেমেরই সলিউশন আছে হয়তো।

তা হলে ?

সলিউশনটা খুঁজে পেলে প্রবলেমটা মিটে যাবে।

মনে হচ্ছে, সলিউশনটা আপনি জানেন।

না, জানলে নির্বাসন নিয়েছি কেন ?

এখানে কীভাবে সময় কাটে আপনার ? বোরড্ হন না ?

বোরডমও আছে, তবে সকালবেলাটা চমৎকার।

তখন বোর লাগে না বুঝি ?

না। সকালে বেড়াতে যাই। ফাঁকা জায়গা। বেড়ানোর পক্ষে চমৎকার।

তারপর ?

ফিরে এসে ছবি আঁকি। তখন জ্ঞান থাকে না।

রোজ ?

রোজ। ছবিই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

আগে বছরে আট দশটা আঁকতেন। এখনও তাই ?

না। এখন সংখ্যাটা অনেক বেড়েছে।

বায়াররা কি এখানে আসে ?

খুব কম। আমার ছবি এজেন্টের মারফতই বেশি বিক্রি হয়।

আজকাল এগজিবিশন করেন না, না ?

না। ছবি বেশির ভাগই বিক্রি হয়ে যায়। এগজিবিশনটন প্রাইমারি স্টেজে হত। এখন ছবি জমে থাকে না তো।

আপনার তো এখন প্রচণ্ড ডিম্যান্ড!

হুজুগই ধরতে পার। যারা কেনে তারা কি ছবি বোঝে ?

তা বটে।

যারা আঁকে তারাও বোঝে না।

সকালে তা হলে শুধু ছবি আঁকা ?

হ্যাঁ। সকালে আলোটা ভাল পাওয়া যায়। মেজাজটাও থাকে ভাল।

দুপুরে ঘুমোন ?

না, ঘুমোনোর অভ্যাসটা কম। দুপুরে বই পড়ি।

গল্পের বই ?

তাও। তবে ইতিহাস আর বিজ্ঞানই বেশি।

এখানকার লোকজন দেখা করতে আসে না ?

আমি তো আনসোশ্যাল। বেশি মিশি না কারও সঙ্গে। তবে দুচারজনকে চিনি।

কথা বলতে, আড্ডা মারতে আপনার ভাল লাগে না ?

না। আগে খুব আড্ডা দিতাম, যখন বয়স কম ছিল।

কফি হাউসে ?

কফি হাউস ছিল, বন্ধুদের মেসবাড়ি ছিল, বসন্ত কেবিন ছিল।

সে সব দিনের কথা মনে হয় না ?

হয়। তবে খুব সুখস্মৃতি নয়।

তখনকার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই ?

ইচ্ছে করেই যোগাযোগ রাখি না। কী হবে ?

আড্ডায় তো অনেক ভাব বিনিময় হয়।

হয়তো হয়। তবে আড্ডায় বেশির ভাগই হয় লাইট কথাবার্তা। আমি ওটা আজকাল এনজয় করি না।

বিকেলের দিকটায় বিষণ্ণ লাগে না ?

না। ভালই লাগে।

রাতে ছবি আঁকেন ?

না না। কোনওদিনই আঁকতাম না। এখানে ভীষণ লোডশেডিং। কারেন্ট থাকলেও ভোল্টেজ খুব কম। রাতে কোনও কাজই করা যায় না। এখানে বাধ্যতামূলক হল আর্লি টু বেড।

এত বড় বাড়ি নিয়ে থাকেন, গা ছমছম করে না ?

কেন করবে ? আমার তো ভূতের ভয় নেই।

চোর-ডাকাতের ভয় ?

তাও নেই। কী নেবে ? ভ্যালুয়েবলস তো কিছু থাকে না।

ছবি তো নিতে পারে।

এখানকার চোর ডাকাতেরা ততদূর শিক্ষিত নয় যে, ছবি চুরি করবে। ছবির বাজারদরও তারা জানে না।

তবু তারা আছে তো।

তা আছে শুনেছি। এ বাড়িতে এখনও হানা দেয়নি।

ছবি এঁকে যে আপনি প্রভূত টাকা উপার্জন করেন এটা কি তারা জানে না ?

তা আমি বলতে পারব না। ছবি এঁকে টাকা রোজগার করার ব্যাপারটা শিক্ষিত সমাজের লোকে জানে। এরা ততটা ওয়াকিবহাল নয় বোধহয়। নগদ টাকা আমি অবশ্য বাড়িতে রাখি না।

সে তো বটেই। কলকাতায় যখন ছিলেন তখন বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী আপনার কাছে আঁকা শিখতে আসত।

হ্যাঁ। শেখাতে আমার ভালও লাগে।

এখানে কি কেউ শেখে ?

তেমন নয়। ছবি নিয়ে কে মাথা ঘামায় বল ? এক আধজন আসে।

আপনি শেখান ?

এখানে যারা শিখতে আসে তাদের হাত খুব কাঁচা। শুধু ড্রইং শেখাই। কিন্তু সেটাও খুব ভাল নিতে পারে না।

আপনি এখানে আর কী করেন ?

সন্ধের পর মদ খাই। ওটা নিয়মিত। আর বিশেষ কিছু করি বলে তো মনে পড়ছে না।

এবার আপনাকে একটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন করব। রাগ করবেন না তো।

আরে না। রাগের কী আছে ?

আপনার বয়স বোধহয় সাতচল্লিশ।

ওটা সার্টিফিকেট এজ। আসলে উনপঞ্চাশ।

যাই হোক। আপনার একটা সেক্স লাইফ থাকার কথা।

ওঃ !

রাগ করলেন ?

আরে না। কথাটা হল, প্রয়োজনই আবিষ্কারের জননী।

তার মানে ?

মাঝে মাঝে মেয়েছেলে চলে আসে।

চলে আসে ?

আই ডোন্ট ফোর্স দেম। টাকা অফার করি।

চলে আসে কথাটার অর্থ বুঝতে পারলাম না।

আমার একজন হেলপার আছে। অড জব ম্যান। এ ব্যাপারে সে-ই সাহায্য করেছিল।

অনেক মেয়ে আসে নাকি ?

না না। একজনই। স্থানীয় একজন গরিব মেয়ে। স্বামী নেয় না।

একজনই ?

হ্যাঁ। কিন্তু বেশি নয়। সপ্তাহে একদিন বা বড় জোর দুদিন।

আপনি কি আবার বিয়ে করার কথা ভাবেন ?

পাগল নাকি ?

এরকমই তা হলে কাটিয়ে দেবেন ?

দেখা যাক। কোথা থেকে কবে কী হবে তা নিয়ে ভেবে কী করব ?

কলকাতায় একটা গুজব রটেছে যে আপনি এখানে এসে একটা স্পিরিচুয়াল লাইফ কাটাচ্ছেন। ধর্মকর্ম নিয়ে মেতে আছেন।

মানুষের অনুপস্থিতিতে কত কথাই তো রটে।

আপনি বরাবর নাস্তিক ছিলেন। এখনও তাই ?

নয় কেন ? আমার নাস্তিক্য ভাঙার মতো কিছু তো ঘটেনি।

অনেক সময়ে নির্জনে একা বাস করতে করতে ঈশ্বরচিন্তাও আসতে পারে তো।

না। আমার মনে হয় না, ঈশ্বরচিন্তা ওরকম অকারণে আসে। আমার ঈশ্বরকে দরকার হয় না। রং, রেখা আর পৃথিবীর রূপ এসবই আমার ঈশ্বর।

সে তো বটেই। আপনার এত যে দেশজোড়া খ্যাতি, এত টাকা এগুলো তো আপনি ভোগও করেন না। এখানে তো দেখছি স্পার্টান লাইফ লিড করছেন। ফ্রিজ বা টিভি আছে কি ?

পাগল। ওসব দিয়ে কী হবে ? একা মানুষ, ফ্রিজ দিয়ে কী করব ? মদ খাওয়ার বরফ আমার চাকর বান্টা এনে দেয়। অবশ্য কিউব নয়, চাঙড়। ওতেই হয়ে যায়।

সিনেমা টিনেমা দেখতে ইচ্ছে করে না ?

কোনওদিনই করত না। সিনেমা আমি খুব কমই দেখেছি। এখন তো আরও ইচ্ছে করে না।

আপনার বাগান করার শখ নেই ? সামনের বাগানটা তো দেখছি আগাছায় ভর্তি।

ওটাই তো আমার ভাল লাগে। তোমাদের কাছে আগাছা হতে পারে, আমার কাছে নয়। সাজানো বাগানের চেয়ে এই

ওয়াইল্ডনেস এবং এই হ্যাপাজার্ড গাছগাছালি আমার বেশি প্রিয়। ওটা অ্যাটিচুডের ওপর নির্ভর করে।

তাই দেখছি। আপনার রং, তুলি, ক্যানভাস সব কলকাতা থেকেই আসে ?

হ্যাঁ। আমার এজেন্ট দিয়ে যায়। আমি অবশ্য আজকাল বিদেশ থেকেই রং আনাই। এখানকার রঙের কোয়ালিটি আমার পছন্দ নয়।

হ্যাঁ, অ্যান্ড ইউ ক্যান অ্যাফোর্ড দ্যাট। বাড়ির খবর টবর পান ?

বিশেষ নয়। মা বোধ হয় তাড়না করে, তাই মাঝে মাঝে আমার মেয়েরা চিঠি লেখে। পোস্টকার্ডে।

আপনি জবাব দেন ?

এক লাইন দু লাইনে দিই। আমি ভাল আছি এ খবরটা না পেলে মা হয়তো চলেই আসবে খবর নিতে। মায়েদের তো জানো।

আপনি কি মাকে একটু মিস করেন ?

না, মিস করি বলাটা বাড়াবাড়ি। তবে একটু মায়ের কথাই যা মনে হয়।

আপনি নিশ্চয়ই পরিবারকে টাকা পাঠান ?

তা পাঠাব না ? পাঠাতেও হয় না। আমার স্ত্রীর আর আমার জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যায়। ছবির টাকা ছাড়াও আমার স্ত্রীর চাকরির রোজগার আছে। সুতরাং বুঝতেই পারছ—

হ্যাঁ, আমি জানি দে আর ভেরি ওয়েল অফ।

ওদের বড়লোকই বলতে পার তুমি। বেহালায় অত বড় বাড়ি, গাড়ি, অল সর্টস অব স্ট্যাটাস সিমবলস।

মেয়েদের বা ছেলেকে মিস করেন না ?

নাঃ। সবাই তো বড়ই হয়ে গেছে। দে আর বিজি উইথ দেয়ার স্টাডিজ অ্যান্ড ক্যারিয়ারস।

বউদির কী অ্যাটিচুড আপনার প্রতি ?

ভেরি কোল্ড, ভেরি প্যাসিভ। যেমনটা ছিল।

উনি আপনাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেননি ?

হ্যাঁ, দু বছর আগে আমার এক শালাকে পাঠিয়েছিল। সে মিনমিন করে কী যেন বলছিল। সব সংসারেই অশান্তি হয়েই থাকে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খিটিমিটি হতেই পারে...

আপনি তাকে পাত্তা দিলেন না তো।

পাত্তা দেওয়ার মতো ব্যক্তিত্ববান সে নয়।

কী বললেন তাকে ?

বললাম, বাড়ি যাও। দুনিয়াটা গোলগাপ্পা নয়। সব কিছু বুঝবার মতো মাথাও তোমার নেই। ভাগিয়ে দিলাম।

বউদি কি চিঠিপত্র কিছু দেননি কখনও ?

না। শী ইজ অলসো এ হার্ড নাট টু ক্র্যাক।

আপনি কি তাঁকে আর পছন্দ করেন না ?

কোনওদিনই করিনি।

অথচ সবাই জানে আপনাদের লাভ ম্যারেজ।

লাভ ম্যারেজ ব্যাপারটাই একটা ধাপ্পা।

কেন ?

প্রেম করে যেসব বিয়ে হয় সেই প্রেমগুলো বেশিরভাগই স্কিন ডিপ। আই নেভার লাভড হার। সাময়িক একটা মোহ আর জেদ থেকে বিয়েটা হয়েছিল। এনিওয়ে শী হ্যাজ নাথিং টু ল্যামেন্ট ফর। বেশ কয়েক বছর বিবাহিত জীবন যাপন করেছি। নাউ আই ওয়ান্ট মাই ফ্রিডম।

এটাই কি সেই ফ্রিডম ?

একরকম ফ্রিডমই। অন্তত বন্ডেড তো নই।

এমন তো হতে পারে যে আপনি একদিন অনুতপ্ত হয়ে ফিরে যাবেন।

তা যাব না। যেতাম, যদি মান অভিমান থেকে চলে আসতাম। এটা অমন হালকা পলকা ব্যাপার নয়। আমি স্ত্রীর সঙ্গ কখনওই উপভোগ করিনি। কোনও টানও নেই তাঁর প্রতি। ছেলেমেয়েদের প্রতিও নেই। আই নেভার ওয়াজ এ গুড ফাদার। তবে ছেলেমেয়েরা ভাল থাকুক সেটা অবশ্য চাই।

আপনি কি তা হলে এখানে বেশ ভাল আছেন ?

দেখতেই তো পাচ্ছ। কিছু খারাপ নেই। ভাল থাকাটা নির্ভর করে কতগুলো ফ্যাক্টরের ওপর। ভাল স্বাস্থ্য, ভাল অ্যাটিচুড, স্যাটিসফ্যাক্টরি কাজ...

অ্যান্ড সেক্স ?

অলসো সেক্স।

আর কিছু নয় ? ধরুন গুড কম্পানি ?

কম্পানি ছাড়াও চলে। ওটা অ্যাটিচুডের ওপর নির্ভর করে।

তা হলে কি বলব আপনি এখনই প্রকৃতপক্ষে জীবনকে উপভোগ করছেন ?

না, তা বললে মিথ্যে বলা হবে। জীবনকে আমি কি আগেও উপভোগ করিনি কখনও কখনও ? ভাল একটা ছবি আঁকলে, ভাল একটা গান শুনলে, সুন্দর দৃশ্য দেখলে আমি বেঁচে থাকাটাকে সার্থক বলেই তো ভেবেছি বহুবার। মনে আছে প্যারিসে আমি প্রথম গিয়ে টানা পনেরো দিন ল্যুভ মিউজিয়ামে ঘুরে বেরিয়েছি। কেমন যেন স্টান্‌ড্‌ অ্যান্ড হিপনোটাইজড। সেটাও তো উপভোগ।

আর এখন ?

এখনও তাই। মাঝে মাঝে উপভোগ করি।

আপনি গানের কথা বললেন। আপনার কি টেপ রেকর্ডার আছে ?

না। ক্যাসেট বাজিয়ে গান শুনতে ইচ্ছে করে না।

তা হলে গানটা আর উপভোগ করেন না ?

তোমাকে একটা আশ্চর্য কথা বলব ?

বলুন না। শুনতেই আসা।

তুমি হয়তো ঠিক বিশ্বাস করবে না। কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি।

বলুন শুনি। বিশ্বাস করব না এমন গ্যারান্টি কে দিতে পারে ?

এ জায়গাটা তো দেখছ ভীষণ নির্জন।

হ্যাঁ।

এখানে দিনেদুপুরে ঝিঁঝির শব্দ শোনা যায়। সারাদিনে হয়তো একটাও মানুষের গলার স্বর কানে আসে না। এই যে নির্জনতা, মাঝে মাঝে এর শব্দহীনতা আমাকে অভিভূত করে ফেলে।

বুঝতে পারছি।

মাঝে মাঝে কী হয় জানো? গভীর নিস্তব্ধতায় ডুবে চুপ করে বসে থাকতে থাকতে আমার মনে হয় এই নিস্তব্ধতার ভিতরে যেন একটা সুর লয় খেলা করছে। খুব গভীরে যেন একটা অশ্রুত সংগীত। এ ঠিক বোঝানো যায় না। কানে শোনার জিনিস নয়। কিন্তু অনুভূতিতে যেন ধরা দেয়।

এরকম কি প্রায়ই হয়?

না না, খুব কম হয়। অনেকদিন বাদে বাদে।

এরকমটা কিন্তু হতেই পারে। বড় বড় ওস্তাদের নাকি হয়।

আমি ওস্তাদ নই। গান তো আমার সাধনা নয়।

তা হোক। আপনি তো সূক্ষ্ম অনুভূতির মানুষ। ধ্যানস্থ মানুষ।

ওটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। ওরকম কমপ্লিমেন্ট আমার পাওনা নয় কিন্তু।

এটা কমপ্লিমেন্ট নয়। একটা এক্সপ্ল্যানেশন মাত্র।

থ্যাঙ্ক ইউ।

এখন আপনি কী বিষয় নিয়ে ছবি আঁকছেন?

প্রধানত এই জায়গাটা নিয়ে। পাখি, ফুল, কীট পতঙ্গ নিয়েও আঁকি। আবার ভিশন থেকেও আঁকি। একদিন স্বপ্নে একটা জাহাজ দেখলাম। কালো সমুদ্রের ওপর ভাসছে। অদ্ভুত জাহাজ। বিশাল উঁচু, বিরাট বড়। সেই জাহাজটা বড় ক্যানভাসে প্রায় এক মাস ধরে আঁকলাম। কিন্তু মনের মতো হল না।

ছবিটা কি আছে?

না, বিক্রি হয়ে গেছে।

আপনি আগে আপনার ছবিগুলোর ফটো তুলে রাখতেন। আজকাল রাখেন না ?

নাঃ। কী হবে রেখে ? মনে হয় আমার এজেন্ট রাখে।

একটা রেকর্ড থাকা ভাল।

কম বয়সে আমারও তাই মনে হত। এখন আর মায়া নেই যে। আঁকি, বিক্রি করি, তারপর ভুলে যাই।

আপনি একসময়ে ক্রিটিকদের ওপর খুব খাপ্পা ছিলেন। একবার একজন আর্ট ক্রিটিককে মারধরও করেছিলেন। তার নাম নব দাস, মনে আছে ?

খুব আছে। তখন খুব রিঅ্যাকশন হত।

আজকাল হয় না ?

হবে কী করে ? আমার এখানে পত্রপত্রিকা আসে না। এলেও পড়ি না। যার যা খুশি লিখুক।

পড়েন না বলেই কি রিঅ্যাক্ট করেন না ? পড়লে করতেন ?

না, না, পড়লেও করতাম না। আসলে কী জানো, আমি আজ বুঝেছি, আর্ট ক্রিটিকরা ছবি কিস্যু বোঝে না। তার চেয়েও মারাত্মক কথা আর্টিস্ট নিজেও বোঝে না। এই সাঙ্ঘাতিক সত্যটা বুঝতে পারার পর আমি সংযত হয়ে গেছি।

সমঝদাররা কি একথা মানবেন ? আপনি সর্বজিৎ সরকার—কত নাম-ডাক আপনার !

ওসবও খুব ফুঁকো ব্যাপার। আর্টের জগতে একটা মস্ত ফাঁকিবাজি আছে।

আপনি সেটা জেনেও তা হলে আঁকেন কেন ?

আঁকার নেশায়। কিছু তো করছি। ড্রয়িং জানি, তুলি চালাতে পারি, রং বুঝি, প্যাটার্ন বুঝি। এগুলো নিয়ে একটা খেলা।

ছবির কোনও ফিলজফি নেই বলছেন ?

সচেতনভাবে নেই। তবে কেউ কোনও অর্থ বার করে নিতে পারলে ভালই।

এটা তো সাঙ্ঘাতিক কথা !

খুব সাঙ্ঘাতিক কথা। তবু অনেকটাই সত্যি। তবে একটা কথা আছে।

কী কথা ?

একজন জাত আর্টিস্ট যাই আঁকুক ছবিটার মধ্যে কিন্তু একটা সৌন্দর্য থাকবেই। থাকবে সূক্ষ্ম সিমেট্রিকাল নকশা। থাকবে কিছু অনুভূতিও। সবটা ফেলে দেওয়া যাবে না। পিকাসো অনেক অর্থহীন, আবোল তাবোল ছবি এঁকেছেন। কিন্তু তার মধ্যেও দেখবে কিছু একটা আছে। যেটা আছে সেটাকে সেই আর্টিস্টও বুঝিয়ে দিতে পারবে না।

বাঃ, এই তো অ্যাপ্রেসিয়েটও করছেন দেখছি।

স্ববিরোধী কথা বললাম নাকি শবর ?

একটু কনফ্লিক্টিং। কিন্তু আর্ট জিনিসটা বোধ হয় ওরকমই। কিছু নেই, না থেকেও আছে।

চা খাবে ?

না, আমি চা খাই না।

তাও তো বটে, তোমার তো কোনও নেশাই নেই। ভুলে গিয়েছিলাম।

আপনি ইচ্ছে করলে খেতে পারেন।

না। এখন বেলা এগারোটা বাজে। এ সময়ে চা খাই না।

আমি আপনার আঁকার বাধা সৃষ্টি করছি না তো !

না। আজ রবিবার। রবিবার আমি ছুটি নিই।

আপনার তো রোজই ছুটি।

হ্যাঁ, সেইজন্যই একটা দিন একটু আলাদা ছুটির মেজাজ তৈরি করে নিতে হয়। এবার আসল কথাটা কি বলবে ?

আসল কথা ! আবার আসল কথা কী ?

সর্বজিৎ হাসল। বলল, শবর, তুমি একজন অতি ধূর্ত পুলিশ অফিসার। শুধু আর্ট নিয়ে আলোচনা করতে কলকাতা থেকে এত দূর আসনি। আমি জানি।

শবর মৃদু হেসে বলল, আমি সমঝদার না হলেও আর্ট

নিয়ে আমার কিছু নাড়াচাড়া করার অভ্যাস আছে।

জানি। তোমার আর্ট নিয়ে নাড়াচাড়াও বোধহয় ক্রাইম ডিটেকশনের জন্যই।

তাই নাকি ?

তুমি একবার বলেছিলে, একটা কার যেন ছবি দেখে তুমি একটা মার্ডার কেস সলভ করেছিলে।

ঠিক তা নয়। তবে সামটাইমস ইট হেল্পস্।

তুমি আমাকে কোনও ক্রাইমের জন্য ধরতে আসনি তো শবর ?

আরে না। কী যে বলেন।

স্ত্রী আর পরিবার ছেড়ে চলে আসা ছাড়া আমার আর তেমন কোনও অপরাধ নেইও। তবে হ্যাঁ, নব দাসকে মেরেছিলাম। সেটাও একটা ক্রিমিন্যাল অ্যাক্ট বটে। তবে নব পুলিশে যায়নি। আমি ওর কাছে ক্ষমাও চেয়েছিলাম।

সবই জানি।

তা হলে এবার আসল কথাটা বলে ফেলো।

আচ্ছা আপনি কি আজকাল ন্যুড আঁকেন ?

ন্যুড ? তা আঁকি বোধ হয় মাঝে মাঝে। কেন ?

ইদানীং কি আপনি পর পর বেশ কয়েকটা ন্যুড এঁকেছেন ?

উহুঁ। ন্যুড খুব কম আঁকি। ভীষণ রেয়ার। হঠাৎ ন্যুড নিয়ে কথা উঠছে কেন ?

আপনি যদি কিছু মনে না করেন এবং প্রশ্নটার জন্য আমার নির্লজ্জতাকে ক্ষমা করেন তা হলে একটা প্রশ্ন করতে পারি কি ?

আরে, ফর্মালিটি ছেড়ে প্রশ্নটা করেই ফেল। আমি খোলামেলা মানুষ। নাথিং টু হাইড। একটু আগে তো আমার সেক্স লাইফ নিয়েও প্রশ্ন করেছ, কিছু মনে করেছি কি ?

এটা একটু পারসোন্যাল।

গো অ্যাহেড।

আপনি কখনও আপনার স্ত্রীর ন্যুড এঁকেছেন কি ?

এই কথা ! হাঃ হাঃ, হ্যাঁ, বিয়ের পর একবার এঁকেছিলাম। খুব ছোট করে।

আপনার স্ত্রী আপত্তি করেননি ?

আরে না। ওর কয়েকটা পোর্ট্রেট এঁকেছিলাম। তারপর উনি নিজেই একদিন বললেন, উনি আমার ন্যুড মডেল হতে চান। ব্যাপারটা কি জানো ? তখন ইলা নামে একটি মেয়ে আমার মডেল হত। শী ওয়াজ কোয়াইট অ্যাট্রাকটিভ। সম্ভবত আমার স্ত্রী ওঁর সম্পর্কে একটু জেলাস ছিলেন। তাই ওঁকে সরিয়ে নিজে মডেল হতে চেয়েছিলেন।

তার ফল কী হয়েছিল ?

খুব খারাপ। যখন আমার স্ত্রীকে মডেল করে ন্যুড ছবিটা আঁকলাম তখন উনি বেঁকে বসলেন। ও ছবি বিক্রি করা চলবে না। এগজিবিট হিসেবেও দেওয়া যাবে না। দি সেন্টিমেন্ট ওয়াজ কোয়াইট লজিক্যাল।

সেই ছবিটার শেষ অবধি কী হল ?

ফেসটা বদলে দিতে হল।

এরকম ঘটনা আর কখনও ঘটেনি ?

না। ইন ফ্যাক্ট বিয়ের এক বছর পর থেকে আমি আমার স্ত্রীর কোনও ছবিই আঁকিনি। ন্যুডের প্রশ্ন তো ওঠেই না। কিন্তু কেন এই প্রশ্ন করছ জানতে পারি কি শবর ?

আপনার দুই মেয়ে এবং এক ছেলে। মেয়েরা এখন একজন যুবতী এবং একজন কিশোরী। ঠিক তো।

হ্যাঁ।

কোনও বাপের পক্ষে তাঁর নিজের যুবতী বা কিশোরী মেয়ের ন্যুড আঁকা কি সম্ভব বলে আপনার মনে হয় ?

এ প্রশ্ন কেন করছ জানি না। তবে অনেক আর্টিস্টের ওসব সংস্কার থাকে না। কিন্তু আমার কথা যদি বলো তা হলে বলব আমার ওরকম রুচি কখনও হয়নি, হবেও না।

আপনার মুখ থেকে এ কথাটা শুনবার জন্যই আসা। আপনাকে নিয়ে কলকাতায় এখন একটা বিচ্ছিরি কন্ট্রোভার্সি

চলছে।

কী ব্যাপার খুলে বলতে পার ?

রামপ্রসাদ সিংঘানিয়া নামে একজন বড় আর্ট কালেকটার আছে, জানেন ?

চিনি না। আজকাল আর্ট কালেকটারের অভাব কি ?

রামপ্রসাদ সিংঘানিয়া তার কালেকশন অব আর্টসের একটা এগজিবিশন দিয়েছেন।

ও। তা হবে।

সিংঘানিয়ার এই এগজিবিশনে প্রায় আশিটা ছবি ডিসপ্লে করা হয়েছে। তার মধ্যে ত্রিশখানাই আপনার।

বল কী ? একজনের কাছে আমার এত ছবি ?

লোকটা শুধু কালেকটরই নয়, ছবির ব্যবসাও তার আছে।

হ্যাঁ, ছবি তো এখন ব্যবসারই জিনিস।

আপনার এই ত্রিশখানা ছবির মধ্যে অন্তত দশটা ছবি নিয়ে একটা সিরিজ রয়েছে। সিরিজটার নাম মেনি ফেসেস অব ইভ।

যদ্দূর মনে পড়ে এরকম কোনও সিরিজ আমি আঁকিনি।

ভাল করে ভেবে দেখুন।

ফটোর রেকর্ড না রাখলেও আমার মেমরি খুব ভাল। আর ছবির টাইটেলের একটা বাঁধা লিস্ট আমার ডায়েরিতে লেখা থাকে। ফর রেফারেন্স। কারণ, বুঝতেই পারছ, ছবি একটা হাইলি কমার্শিয়াল কমোডিটি।

বুঝতে পারছি। তা হলে মেনি ফেসেস অব ইভ নামে কোনও সিরিজ আপনি আঁকেননি ?

না। এই সিরিজেই কি ন্যুড ছবিগুলো রয়েছে ?

হ্যাঁ। শুধু ন্যুড ছবিই নয়। ছবিগুলো আপনার স্ত্রী এবং মেয়েদের নিয়ে আঁকা।

মাই গড। এ তো সাঙ্ঘাতিক কথা।

কতটা সাঙ্ঘাতিক তা আপনি এখানে বসে ঠিক অনুমান করতে পারবেন না।

তাই নাকি ? ছবিগুলো কি খুব অবসিন ?

খুব। যাকে রগরগে বলা যায় তাই।

সিংঘানিয়াকে তোমরা অ্যারেস্ট করছ না কেন ?

সেটা পরে হবে, আপনি ছবিগুলো আইডেন্টিফাই করার পর। কিন্তু দি ড্যামেজ ইজ অলরেডি ডান।

লোকটা তো ক্রিমিন্যাল দেখছি।

সেটা তো হতেই পারে। কিন্তু এর ফলে আপনার স্ত্রী এবং মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা ভীষণভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আপনার স্ত্রী একটা কো-এডুকেশন কলেজের অধ্যাপিকা। তিনি কলেজে যেতে পারছেন না। আপনার বড় মেয়ে কলেজে পড়ে, ছোটটি স্কুলে। তারা স্কুল-কলেজ তো দূরের কথা, রাস্তাতেই বেরোতে পারছে না।

ছবিগুলো এতটা পাবলিসিটি পেল কীভাবে ?

সিংঘানিয়া ছবিগুলো ডিসপ্লে করার পরই পত্রপত্রিকায় ছবিগুলো নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। অনেক কাগজেই ওই সিরিজটার ফটোগ্রাফ ছাপা হয়েছে। ক্রিটিকদের অনেকেই আপনার স্ত্রী ও মেয়েদের চেনে। তারাই প্রথম পয়েন্ট আউট করে যে সর্বজিতের ইভ আসলে তার স্ত্রী এবং দুই মেয়ে।

নাউ আই অ্যাম ভেরি অ্যাংরি শবর। সিংঘানিয়াকে একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার।

উত্তেজিত হবেন না। আগে শুনুন। আপনার স্ত্রী প্রথমে ছবিগুলো কিনে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সিংঘানিয়া বিক্রি করেনি। কারণ এই এগজিবিশনের কোনও ছবিই বিক্রির জন্য ছিল না। সিংঘানিয়া ক্রিমিন্যাল কি না সেটা পরে দেখা যাবে। কিন্তু পরিস্থিতি খুব জটিল। ক্রিটিকরা আপনার সম্পর্কে কাগজে বিষোদ্গার করেছে, আপনার রুচি, বিকৃত যৌনতা, প্রতিহিংসাপ্রবণতা এবং অপ্রকৃতিস্থতার কথা তারা তীক্ষ্ণ ভাষায় লিখেছে।

আমি তো তা জানি না। জানতে পারলে এগজিবিশনটা ইনজাংশন দিয়ে বন্ধ করে দিতাম।

সেটা করা হয়েছে। আপনার স্ত্রী লিগ্যাল অ্যাকশন নিয়েছেন। কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গেছে। আপনার স্ত্রী মনে করেন নিজের পরিবারের ওপর প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েই আপনি একাজ করেছেন। আপনার মেয়েরা এই ঘটনার পর প্রচণ্ড কান্নাকাটি করেছে। আপনার স্ত্রী আপনার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনছেন। সেইসঙ্গে হয়তো ডিভোর্সের মামলাও।

ছবিগুলো যে আমার আঁকা নয় এটা তাদের বোঝা উচিত ছিল। আমার আঁকার কিছু ক্যারেকটারিস্টিকস আছে।

আমরা সেই অ্যাঙ্গেলটাও দেখেছি।

কী দেখলে ?

কলকাতায় কোনও ছবি বিশেষজ্ঞ— অর্থাৎ পেশাদার বিশেষজ্ঞ নেই। আমরা তাই ক্রিটিক এবং অন্যান্য আর্টিস্টের মতামত নিই। তারা প্রত্যেকেই বলেছেন, ছবিগুলো সর্বজিৎ সরকারেরই আঁকা। অর্থাৎ আপনি যে ক্যারেকটারিস্টিকসের কথা বলছিলেন তা সবগুলোতেই আছে। নব দাস একটি বিখ্যাত ইংরিজি কাগজে লিখেছে, সর্বজিৎ সরকার চিরকালই যৌন বিকারের শিকার। সে তার বউ আর মেয়েদের বাজারে নামিয়ে দূষিত আনন্দ পাচ্ছে, এটা তার মতো নিম্নরুচির মানুষের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার।

হুম, ব্যাপারটা তা হলে জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হ্যাঁ, বেশ জটিল। নইলে আমাকে এতদূর আসতে হত না।

এটা কি তোমার অফিসিয়াল ভিজিট, না ব্যক্তিগত ?

ব্যক্তিগত। এটা সেই অর্থে পুলিশ-কেস নয়। আমার একটা সন্দেহ ছিল ছবিগুলো নকল।

কেন সন্দেহ হল ?

আমি আপনাকে দীর্ঘদিন চিনি বলে।

তুমি কি বিশ্বাস করো যে একাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয় ?

মানুষের পক্ষে সবই সম্ভব। তবু আমি আপনার কথা বিশ্বাস করছি। এখন বলুন তো এ কাজ কে করতে পারে

এবং কেন ?

কী করে বলব বল তো ! আমার কেমন শত্রু থাকতে পারে ? আমি রগচটা মানুষ ছিলাম ঠিকই, কিন্তু কারও কোনও গর্হিত ক্ষতি করেছি বলে তো মনে পড়ে না।

আরও একটা কথা।

বলো।

অন্তত চারটি ছবিতে ইভের সঙ্গে আদমকেও দেখা গেছে। কে জানেন ?

না, বলো।

একজন আপনার বন্ধু সুধাময় ঘোষ।

সে কী ?

দুটো ছবিতে সুধাময় ঘোষ এবং আপনার স্ত্রীকে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে আঁকা হয়েছে।

আর ?

আপনার দুই মেয়ের সঙ্গে আরও দুটি আদমকে আমরা পাচ্ছি। একজন আপনার বড় মেয়ের বন্ধু বান্টু সিং। অন্যজন ছোট মেয়ের বন্ধু ডেভিড।

এদের তো আমি চিনিই না।

আপনি না চিনলেও যে এঁকেছে সে চেনে।

এটা কি একটা ষড়যন্ত্র বলে তোমার মনে হয় শবর ?

সে তো বটেই।

সিংঘানিয়াকে তোমরা ক্রস করনি ?

করেছি। সে পরিষ্কার বলেছে আপনার এজেন্টের মাধ্যমে সে ছবি কিনেছে। আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে সে চেনে না।

আমার এজেন্ট কী বলে ?

আপনার এজেন্ট রতন শেঠ হার্টের ট্রিটমেন্ট করতে অ্যামেরিকায় গেছে। তার ছেলেরা বলছে, ছবিগুলি ওরিজিন্যাল।

বলল ?

হ্যাঁ, তারা বলছে এখান থেকেই তারা প্যাক করে ছবিগুলো প্রায় ছয় মাস আগে নিয়ে যায়।

ব্যাপারটা যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

মুস্কিল হল, শুধু ওই ইভ সিরিজের ছবিগুলির জন্য আপনার পাওনা দশ লাখ টাকা তারা ব্যাংকে আপনার অ্যাকাউন্টে জমাও দিয়েছে।

টাকা জমা দেওয়াটা বড় কথা নয়, প্রমাণও নয়। ওরা সব সময়েই আমার ছবি নিয়ে যায় এবং বিভিন্ন সময়ে ব্যাংকে টাকা জমা করে।

সেটা ঠিক কথা। আমি জানতে চাই ওরা কি মিথ্যে কথা বলছে ?

হ্যাঁ শবর। এটা একটা চক্রান্ত।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু আপনি সোনার ডিম-পাড়া হাঁস। অন্তত ওদের কাছে। আপনাকে ফাঁসিয়ে ওদের লাভ কী ?

ওরা আর কারও কাছে টাকা খেয়ে এটা করেছে।

না, আমার তা মনে হয় না।

তোমার কী মনে হয় ?

আপনার ছবি ট্রান্সপোর্ট করার সময় বা এজেন্টের গো-ডাউনে বা কোথাও ছবিগুলো সুইচ করা হয়েছে।

মাই গড !

কারণ আপনার এজেন্ট বা সিংঘানিয়া কেউ খুব একটা মিথ্যে কথা বলছে বলে মনে হয় না। আপনি চক্রান্ত বলে সন্দেহ করছেন। আমিও তাই করি। আপনি কবে কলকাতা যেতে পারবেন ?

যাওয়া তো ইমিডিয়েটলি দরকার শবর।

মেক ইট টু-ডে অর টুমরো।

গিয়ে কী করতে হবে বলো তো !

একটা প্রেস কনফারেন্স ডাকুন। ছবিগুলো যে আপনার নয় তা স্ট্রংলি বলুন।

ছবিগুলো আমি দেখতে চাই।

সেটা অ্যারেঞ্জ করা যাবে। আমি আপনার জন্য ছবিগুলোর ফটো প্রিন্ট নিয়ে এসেছি। দেখুন।

সর্বজিৎ দেখল। বারো বাই আট ইঞ্চির পরিষ্কার রঙিন

প্রিন্ট। কোনও সন্দেহ নেই যে ছবিগুলি যে এঁকেছে সে সর্বজিতের আঁকার শৈলী জানে। অতিশয় নিপুণ এই চাতুরী সে নিজে ছাড়া আর কারও পক্ষেই ধরা সম্ভব নয়। দুটো ছবিতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সুধাময় এবং তার স্ত্রী ইরা আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে আছে।

নিজের দুই মেয়ে নিনা আর টিনার ছবিগুলোর দিকে চেয়ে লজ্জায় ঘেন্নায় গা রি-রি করছিল সর্বজিতের। এক আধবার চোখ বুলিয়েই সে ছবিগুলি শবর দাশগুপ্তকে ফেরত দিল।

ছবিগুলো কেমন দেখলেন ?

কেমন আর দেখব। নকল।

কলকাতার কিছু কাগজ কিন্তু ব্যক্তিগত অ্যাঙ্গেলটা অ্যাভয়েড করে ছবিগুলোর খুব প্রশংসাও করেছে।

তাই নাকি ?

কিছু মনে করবেন না, আপনার স্ত্রীর এখন বয়স কত ?

হিসেবমতো আটত্রিশ।

শি লুকস ইয়ং।

হ্যাঁ। শি হ্যাজ গুড লুকস।

সুধাময় ঘোষের সঙ্গে আপনাদের পারিবারিক রিলেশন কেমন ?

সর্বজিৎ একটু চিন্তিত হল। ভেবে বলল, ইরার সঙ্গে প্রেম আছে কি না জানতে চাইছ ?

যদি বলি চাইছি ?

আই ক্যানট হেলপ ইউ। কারণ আমি জানি না। বিয়ের চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই ইরার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এমন খারাপ হয়ে যায় যে, আমি ওর কোনও কিছুই লক্ষ করতাম না। বেশির ভাগ সময়েই তো পড়ে থাকতাম বন্ডেল রোডের স্টুডিওতে। প্রেম হলেও আমার কিছু করার ছিল না।

ছবিগুলোতে আপনার স্ত্রীর কন্টেম্পোরারি চেহারা রয়েছে, নাকি অল্প বয়সের ?

কন্টেম্পোরারি। ছবিগুলো রিয়ালিস্টিক ধরনে আঁকা। মুখ এবং অবয়ব খুব প্রমিনেন্ট। ইরার বাঁ দিকের বুকে একটা

জরুল আছে। সেটাও এঁকেছে। ইট মিনস দি বাস্টার্ড নোজ হার ওয়েল।

সুধাময় ঘোষ সম্পর্কে একটু বলুন।

কী বলব ? সুধাময় ইজ এ নাইস ফেলো। বিগ শট ইন দি ইলেকট্রনিক বিজনেস। কোটিপতি।

আপনার স্ত্রীর প্রতি তার কোনও ক্রাশ ছিল কি ?

কী করে বলব বলো তো! সুধাময় আমার বন্ধু ছিল। তার সঙ্গে আমার সম্পর্কটাও ছিল গভীর। আমার দুঃখের দিনে, ইন মাই আর্লি ডেজ হি হেলপড এ লট। বিয়ের পর তো আমার মাথা গোঁজবার জায়গা ছিল না। সুধাময় আমাকে তার একটা বাড়িতে সস্ত্রীক থাকতে দেয়। নাইস ম্যান, নাইস ফ্রেন্ড। ওর রি-অ্যাকশন কী ?

উনি টোকিওতে রয়েছেন। বিজনেস ট্যুর। তার পর যাবেন রাশিয়া এবং ইউরোপ। হয়তো চিন এবং তাইওয়ানও। ফিরতে দেরি হবে। ওঁর বয়স কত ?

হার্ডলি ফর্টি ফাইভ।

তা হলে কোয়াইট ইয়ং।

হ্যাঁ, আমার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট।

উনি তো বিয়ে করেছেন ?

আলবাত। ওর বউ সোনালি খুব ভাল মেয়ে। এই ঘটনাটা মেয়েটাকে দুঃখ দেবে।

উনি আপাতত স্বামীর সঙ্গে বাইরে।

বাঁচা গেল।

আপনি রিলিফ ফিল করছেন, কিন্তু আমি তা করছি না। ওঁরা থাকলে আমার কাজের সুবিধে হত।

তুমি কি ভাবছ যে, ইরার সঙ্গে যদি সুধাময়ের অ্যাডাল্টারির সম্পর্ক থেকেও থাকে তা হলে তা জেরা করে বের করতে পারতে ?

কনফেশন আদায় করা সহজ নয়। কিন্তু রি-অ্যাকশন দেখে অনুমান করা সম্ভব।

সেক্ষেত্রে ইরাকেই তো প্রশ্ন করতে পারতে। তার

রি-অ্যাকশন দেখে অনুমান করো।

ইরা দেবীর মানসিক অবস্থা এখন ভারসাম্যহীন। তিনি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে আছেন আপনার ওপর। এ অবস্থায় ওঁকে ওসব সেনসিটিভ ব্যাপারে প্রশ্ন করাটা ঠিক নয়।

তুমি এই তদন্তের কাজ কি প্রাইভেটলি করছ? নিজের গরজে? নাকি অফিসিয়ালি?

অফিসিয়ালি। ইরা দেবী আপনার নামে এফ আই আর করেছেন। পুলিশের বড় কর্তারা তদন্তের ভার আমাকে দিয়েছেন।

কিন্তু একটু আগেই তো তুমি বলেছ যে, এটা তোমার ব্যক্তিগত সফর।

সেটাও সত্য। আমি ঠিক পুলিশ হিসেবে আপনার কাছে আসিনি। এসেছি ব্যক্তিগত উদ্যোগে। পুলিশ কেসটা খুব সিরিয়াসলি নিচ্ছে না। তাই তাদের এ ব্যাপারে একটা গয়ংগচ্ছ ভাব আছে। সিরিয়াস ক্রাইম সামাল দিতে তাদের হিমসিম খেতে হয়, পারিবারিক কেচ্ছা নিয়ে তদন্তে সময় দেওয়ার উপায় নেই।

তুমি একজন অত্যন্ত নামকরা গোয়েন্দা। লালবাজারের প্রায় মাথার মণি। এ রকম একটা কেস-এ তোমার মতো দুঁদে অফিসারকে লাগানোর মানে কি?

শবর একটু হাসল, আপনিও গোয়েন্দাগিরিতে কম যান না দেখছি। কথাটা ঠিকই। আপনাদের কাছে ব্যাপারটা সিরিয়াস হলেও পুলিশের চোখে এটা মাইনর পেটি কেস। আপনার অনুমানও যথার্থ। পুলিশ আমাকে নিয়োগ করেনি। আমি স্বেচ্ছায় তদন্তটা করতে চেয়েছিলাম। কর্তারা আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।

নাই ইউ আর টকিং সেন্স।

সিংঘানিয়ার এগজিবিশন এখানে বন্ধ করা গেলেও দিল্লি বোম্বাই বা বিদেশে বন্ধ করা যাবে না। ছবিগুলি যে নকল এটা প্রমাণ করাটা খুবই জরুরি। আপনি কি সেটা পারবেন?

কেন পারব না? ছবির ক্যারেকাটারই বলে দেবে যে

ওগুলো আমার আঁকা নয়।

তা হলে আপনি কবে কলকাতা যাচ্ছেন ?

আজ হবে না। কাল যাব।

গিয়ে কোথায় উঠবেন ?

আমি তো বন্ডেল রোডের স্টুডিওতেই থাকি কলকাতায় গেলে। অনেকদিন অবশ্য যাওয়া হয়নি।

ওটা কি ভাড়ার ফ্ল্যাট ?

ভাড়াই ছিল। পরে বাড়িওয়ালার কাছ থেকে কিনে নিয়েছি।

আপনার বাড়ির লোক কি স্টুডিওটা চেনে ?

বোধহয়। তবে কেউ কখনও যায়নি।

॥ দুই ॥

ঘরের দরজা খুলে সর্বজিৎ ভিতরে ঢুকে প্রায়ান্ধকার স্টুডিওটাকে একটু অনুভব করার চেষ্টা করল। এ ঘর কেউ ব্যবহার করে না। ধুলো ময়লা এবং বদ্ধ বাতাসের অস্বাস্থ্যকর গন্ধ জমে আছে।

সর্বজিৎ পর্দা সরিয়ে বড় বড় জানালাগুলো খুলে দিল। বাইরের আকাশে বর্ষার মেঘ থম ধরে আছে। দ্রুত ঘনিয়ে আসছে অকাল-সন্ধ্যা।

সর্বজিৎ ঝাড়ন দিয়ে একটা চেয়ার ঝেড়ে নিয়ে একটু বসল পাখার নীচে। ক্লান্ত লাগছে। যশিডি থেকে মাত্র ছয় ঘণ্টার ট্রেন জার্নি। পরিশ্রম যে খুব বেশি হয়েছে তা নয়। তবু ক্লান্ত লাগছে বোধহয় মানসিক অবসাদে, তিক্ততায়।

খানিকটা বিশ্রাম করে সে উঠল। তার পর ঘরদোর পরিষ্কার করতে লাগল।

ফ্ল্যাটে মাত্র দুটোই ঘর। ভিতরের ঘরটা বড়। এটাই তার স্টুডিও কাম বেডরুম। বেড বলতে অবশ্য বেতের তৈরি একটা সরু ডিভান গোছের। তার ওপর তোষক। ঘরময় তার আঁকার সরঞ্জাম, ক্যানভাস ইত্যাদি রয়েছে। আধখ্যাঁচড়া কিছু ছবিও জমে আছে এখানে।

কলকাতা তার আজকাল ভাল লাগে না। রিখিয়া কি বেশি ভাল লাগে? তাও না। তবু ওখানে অন্তত শব্দহীনতা আছে। লোকহীনতা আছে। অনবরত মানসিক সংঘর্ষ-হীনতা আছে। অপেক্ষাকৃত ভাল।

ঘণ্টা খানেকের চেষ্টায় সে ঘরদোর বাসযোগ্য করে তুলল তার পর চা বানিয়ে খেল। স্নান করল। একটু শুয়ে রইল চুপচাপ। আর শুয়েই বুঝতে পারল তার মাথাটা গরম হয়ে আছে। মনটা অস্থির।

একটু তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ টেলিফোনের অচেনা শব্দে চমকে চট্‌কা ভেঙে উঠে বসল সে। বুকটা ধড়ফড় করছে। বহুকাল যন্ত্রটার সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই।

বলুন।

মিস্টার সরকার বলছেন কি ?

হ্যাঁ।

আমি জয়কুমার শেঠ। চিনতে পারছেন তো ?

হ্যাঁ, বলো।

উই আর বিয়িং হাউন্ডেড অ্যারাউন্ড বাই সাম পিপল। কিন্তু সাহাব, আমাদের তো কোনও কসুর নেই।

কসুর নেই ?

না সাহাব। আমরা আপনার প্যাকেজিং-এর মধ্যেই আন-মাউন্টেড ছবিগুলো পেয়ে যাই। আমরা আপনার সঙ্গে কখনও এরকম করতে পারি কি ? পুলিশ বলছে ছবিগুলো একদম জালি। সাবস্টিটিউশন।

আমি যে আজ কলকাতায় আসব কে বলল ?

মিস্টার দাশগুপ্ত বলেছিলেন। আপনি না এলে আমি দু একদিনের মধ্যে রিখিয়ায় গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতাম। পিতাজি অ্যামেরিকায়, উই আর ইন ট্রাবল।

ছবিগুলো আমার আঁকা নয়, জয়। তোমরা ছবিগুলো কোথায় রেখেছিলে ?

ছবি কস্টলি জিনিস সাহাব। আমরা সব ছবি রাখি আমাদের বাড়ির স্টোরে। এ সি ঘর আছে।

সিকিউরিটির ব্যবস্থা কী ?

স্টোর রুমের জন্য সেপারেট সিকিউরিটি নেই। তবে আমাদের বাড়িতে চারজন রিলায়েবল দারোয়ান আছে। সুইচ অর সাবস্টিটিউশন ইজ ইমপসিবল স্যার।

নাথিং ইজ ইমপসিবল। ইমপসিবল হলে ঘটনাটা ঘটল কী ভাবে ?

উই আর অ্যাট এ লস।

সিংঘানিয়াকে তোমরা এই ছবিগুলিই বিক্রি করেছিলে ?

হ্যাঁ সাহাব। উই হ্যাভ আওয়ার রেকর্ড। সিংঘানিয়া আপনার ছবিই বেশি কেনে। এ সাউন্ড বায়ার। পেমেন্টও প্রোন্টো।

ছবিগুলো নিয়ে সিংঘানিয়া কী করেন ?

উনি ফরেনে বিক্রি করেন। হি হ্যাজ গুড কানেকশনস।

তোমরা ছবিগুলো ফেরত নিতে পারবে না ?

উনি নারাজ আছেন। হি ইজ এ রেসপেকটেবল ম্যান। ওঁর দাদা এম পি।

সেটা জেনে কোনও লাভ নেই। উনি যদি আমার ছবি বলে ওগুলো বেচেন তা হলে আমি ওঁর বিরুদ্ধে কেস করব।

স্যার, প্লিজ অ্যাডভাইস আস। আমরা কী করব ? যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। আপনি কেস করলে আমরাও ফেঁসে যাব।

আমি আগে ছবিগুলো দেখতে চাই। ফটোগ্রাফ দেখেছি। কিন্তু ছবিগুলোও দেখা দরকার।

সেটা অ্যারেঞ্জ করা যাবে। তবে সিংঘানিয়া পুলিশের সামনে ছাড়া দেখাবে না।

ওর কি ধারণা আমি ছবিগুলো নষ্ট করার চেষ্টা করব ?

মে বি। হি ইজ এ স্টাবোর্ন্ ম্যান। আপনি কবে প্রেস কনফারেন্স ডাকছেন স্যার ?

কাল।

উই উইল বি দেয়ার। মিস্টার সিংঘানিয়াও যাবেন।

আমি আজই ছবিগুলো দেখতে চাই যদি ?

মিস্টার সিংঘানিয়া হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনালে আছেন। আপনি চাইলে ফোন করতে পারেন। ফোন নম্বর আর স্যুইট নম্বরটা নোট করে নিন স্যার।

সর্বজিৎ নোট করে নিয়ে বলল, তোমরা আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছ ?

হ্যাঁ স্যার। ম্যাডাম তো আমাদের ওপর ভীষণ রেগে আছেন।

থাকারই কথা। তোমরা যে কী কাণ্ড করলে ?

অন গড স্যার, দিস ইজ নো ফল্ট অব আওয়ারস। ডোন্ট প্লিজ বি ক্রসড উইথ আস।

সর্বজিৎ ফোন রাখল। তারপর সিংঘানিয়াকে রিং করল।

মিস্টার সিংঘানিয়া ?

স্পিকিং।

দিস ইজ সর্বজিৎ সরকার।

গুড ইভনিং স্যার। আপনি আসবেন খবর ছিল। আই ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ওয়েটিং টু সি ইউ।

আপনি কি জানেন যে আপনি নকল ছবি কিনেছেন ?

ইন দ্যাট কেস স্যু ইওর এজেন্ট।

তার চেয়ে আপনি একটি কাজ করুন। ছবিগুলো ফেরত দিন। টাকা আমরা দিয়ে দিচ্ছি।

স্যার, ছবিগুলো এখন দারুণ কন্ট্রোভারসিয়াল। কলকাতার পেপারস যা লিখেছে তা লিখেছে। এখন দিল্লি, বোম্বে আর মাদ্রাজের কাগজেও ইট হ্যাজ বিকাম এ হট ইস্যু। অ্যান্ড বিকজ অফ দি কন্ট্রোভার্সি দি প্রাইস হ্যাজ শট আপ আনইউজুয়ালি।

আপনি কী বলতে চাইছেন মিস্টার সিংঘানিয়া ?

আই অ্যাম এ বিজনেসম্যান।

ইউ ওয়ান্ট হাই প্রাইস ? কত ?

ফাইভ লাকস পার পেইন্টিং।

মাই গড !

আমি অলরেডি চার লাখের অফার পেয়ে গেছি। আই অ্যাম ওয়েটিং ফর এ হায়ার প্রাইস।

সিংঘানিয়া, আপনি সাবস্টিটিউট ছবির কারবার করলে যে মুস্কিলে পড়বেন।

স্যার, আমার ওদিকটা কভার করা আছে। আই অ্যাম নট অ্যাফ্রেড অফ ল। আই অ্যাম ডুয়িং নাথিং ইল্লিগ্যাল।

আপনি কি জানেন যে এর ফলে আমার পরিবারের মুখ দেখানোর উপায় নেই।

জানি স্যার। রিগ্রেট ফর দ্যাট। কিন্তু আমার কী করার আছে বলুন।

কিছু করার নেই ? অ্যাজ এ হিউম্যান বিয়িং ?

সেন্টিমেন্ট ইজ অ্যানাদার থিং স্যার। বাট দি ড্যামেজ ডান ওয়াজ নট ইন্টেনশন্যাল। ছবিগুলো আপনি কিনতে চান, ভাল। আপনার সেন্টিমেন্টকে অনার দিতে আই শ্যাল সেল। বাট প্রাইস উইল বি ফাইভ।

ঠিক আছে, এর পর যা করার পুলিশ করবে।

রাগ করলেন মিস্টার সরকার ? আমি আপনার সব চেয়ে বড় বায়ার। আমার স্টকে এখনও আপনার ত্রিশটা ছবি আছে। ইট ইজ এ বিগ নাম্বার।

আপনার মতো বায়ার আমার দরকার নেই।

রাগ করছেন কেন স্যার ? ভাল করে কুল ব্রেনে ভেবে দেখুন। আই অ্যাম নট রেসপনসিবল। সাবস্টিটিউশন তো আমি করিনি। আপনি আজকের পেপার দেখেছেন ?

না।

দেখুন। দুটো পেপারে ইন্টারেস্টিং ইন্টারভিউ আছে।

কার ইন্টারভিউ ?

বান্টু সিং ; আর ডেভিড।

তারা কারা ?

পড়ে দেখুন স্যার। কাল আপনার প্রেস কনফারেন্সে আমি যাব। দেয়ার উইল বি হিটেড এক্সচেঞ্জেস।

আপনি কী করে জানলেন ?

ক্রিটিকরা মানছেন না যে, ছবিগুলো সাবস্টিটিউশন। ইউ হ্যাভ টু ফেস সাম ভেরি আনকমফোর্টেবল কোশ্চেনস।

ঠিক আছে। সেটা আমি বুঝব।

বাই দেন স্যার।

সর্বজিৎ ঠাস করে ফোন নামিয়ে রাখল।

সর্বজিৎ বেরিয়ে গড়িয়াহাট থেকে বেছে বেছে কাগজ দুটো কিনে আনল।

বাড়িতে এসে কাগজ দুটো খুলে যা পড়ল এবং দেখল

তাতে তার মাথা আরও গরম হল। বাণ্টু সিং একজন শিখ। দাড়ি গোঁফ পাগড়ি আছে। ডেভিড দেখতে বেশ সুন্দর। দুজনেই খুবই কম বয়সী।

বাণ্টুকে একজন আর্ট ক্রিটিক নিনার সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে প্রশ্ন করেছে। অত্যন্ত অশ্লীলতা ঘেঁষা প্রশ্ন। বাণ্টু তার জবাবে বলেছে, ইয়েস। ইট হ্যাপেনস সামটাইমস।

বিয়ে করবে কি না প্রশ্ন করা হলে বাণ্টু বলেছে, বিয়ে ইজ এ মিউচুয়াল ডিসিশন। নিনা অ্যান্ড আই আর নট ইন লাভ। বাট উই এনজয় লাইফ টুগেদার।

ডেভিডের জবাবও তাই। একটু হেরফের আছে মাত্র।

একটা পরিবারকে কতখানি নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এমন বে-আব্রু করে দেওয়া যায় তা দেখে অবাক হল সর্বজিৎ। মনটা বিরক্তি ও রাগে ভরে গেল।

ছবিগুলো দেখতে যাওয়ার আর প্রবৃত্তি রইল না তার। সে শুয়ে রইল।

শবর ফোন করল রাতে।

এসে গেছেন তা হলে ?

হ্যাঁ শবর।

কাল প্রেস ক্লাবে আপনার প্রেস কনফারেন্স অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে। খুব ভিড় হবে কিন্তু।

জানি। তুমি কাগজ দুটো দেখেছ ?

ওঃ হ্যাঁ। বাণ্টু আর ডেভিড তো ?

হ্যাঁ।

সমাজটা কোথায় যাচ্ছে শবর ?

আস্ক ইওর ডটারস। শুধু ছেলে দুটোকে দোষ দিয়ে কী লাভ ?

একটা থাপ্পড় খেয়ে যেন কুঁকড়ে গেল সর্বজিৎ। তার পর অনুতপ্ত গলায় বলল, তাই তো শবর।

মাথা ঠাণ্ডা রাখুন। অনেক চোখা প্রশ্ন উঠবে। এখন থেকে তৈরি থাকুন।

আই শ্যাল টেল দি ট্রুথ।

ঠিক আছে।

আমার বাড়ির খবর কী ?

কাল ফিরেই আমি ইরাদেবীর সঙ্গে দেখা করি।

আমি যে আসছি বলেছ নাকি ?

না। তবে উনি জেনে গেছেন।

কিছু বলল ?

না। খুব গম্ভীর।

ঠিক আছে শবর।

একটা কথা দাদা।

বলো।

আপনার ছেলেটা ছোট। বোধ হয় ন'দশ বছর বয়স।

হ্যাঁ।

আপনি বলেছেন গত দশ বছরে আপনার সঙ্গে ইরাদেবীর সম্পর্ক হয়নি। এটা কেমন করে হয় ?

এ প্রশ্নের জবাব কি জরুরি ?

না। তবে জানতে চাইছি বছর দশেক আগে আপনারা হঠাৎ রিকনসাইল করেছিলেন কি না।

না, করিনি।

আপনার কাকে সন্দেহ ?

এনিবডি।

সুধাময় ঘোষ ?

হতেই পারে।

ইউ আর নট ইন্টারেস্টেড টু নো ?

না। আমার ইন্টারেস্ট নেই।

আপনি ছেলেটার পিতৃত্ব স্বীকার করেছেন কি ? মানে কাগজে কলমে ? ইস্কুলের খাতায় ওর বাবার নাম কিন্তু সর্বজিৎ সরকার।

হ্যাঁ। ওটা নিয়ে গণ্ডগোল করিনি। কমপ্লিকেশন বাড়িয়ে কী লাভ ?

ঠিক কথা। ও কে দাদা।

শোনো শবর, এসব নিয়েও প্রশ্ন উঠবে নাকি ?

উঠতে পারে। আপনি অস্বস্তি বোধ করবেন ?

ঠিক তা নয়। আবার এসব প্রশ্নের ট্রুথফুল জবাব দিলে ফের একটা হইচই হবে। আমার স্ত্রী বা পরিবারের আর হেনস্থা আমি চাইছি না। আই অ্যাম নট এনজয়িং ইট এনিমোর।

তার মানে কি আগে এনজয় করতেন ?

তোমাকে সত্যি কথা বলতে বাধা নেই, করতাম। আজ থেকে পাঁচ সাত বছর আগে আমার স্ত্রী অপমানিত হলে আমি বোধ হয় খুশিই হতাম। কিন্তু ওই মনোভাব এখন আমার নেই। রিখিয়ায় চলে যাওয়ার পর থেকে আমার একটা বৈরাগ্যই এসেছে বোধহয়।

আপনি আজ কি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ?

না। দরকার কী ? উনি রেগে আছেন, হয়তো অপমান করবেন।

তা ঠিক।

শবর, আমার মেয়েরা এরকম ছিল না। দে ওয়ার কোয়াইট গুড ইন দেয়ার আরলি ইয়ারস।

হুঁ।

এত তাড়াতাড়ি ওরা এরকম হয়ে গেল কেন ?

কীরকম ?

মর‍্যাল করাপশনের কথা বলছি।

কিছু মনে করবেন না, ওদের তো ওভাবে শেখানো হয়নি, তৈরিও করা হয়নি।

ইটস এ বিট শকিং। আমি নিজে খুব ফ্রি জীবন যাপন করি না ঠিকই, কিন্তু আমি তো অতটা ভেসেও যাইনি।

হয়তো ইরাদেবী ওদের সেই শিক্ষাটা দিয়েছেন। যাকগে, ওটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

মাথা ঘামাচ্ছি না। বড্ড শক্‌ড লাগছে।

মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন।

চেষ্টা করব।

ফোনটা রেখে দেওয়ার পর সর্বজিৎ টের পেল তার বেশ খিদে পেয়েছে। হুইস্কি তার স্টকে আছে বটে, কিন্তু সেটা তার এখন খেতে ইচ্ছে করছে না। বরং কিছু খেলে হয়।

বাইরে বেশ জোরে বৃষ্টি নেমেছে, ঘরে খাদ্যবস্তু কিছুই নেই। রান্নার ব্যবস্থা অবশ্য আছে। ইলেকট্রিক হিটার, হটপ্লেট ইত্যাদি এবং কিছু বাসনপত্রও। খুঁজলে চাল ডাল কি পাওয়া যাবে ?

সর্বজিৎ উঠে রান্নাঘরটা দেখল। চাল পাওয়া গেল একটা বড় স্টেনলেস স্টিলের কৌটোয়। ডালও দেখা গেল আছে। তবে আর কিছুই তেমন নেই, সবচেয়ে ভাল হত বাইরে গিয়ে কোনও রেস্তোরাঁয় খেয়ে এলে। কিন্তু বৃষ্টি না ধরলে সেটা সম্ভব নয়। আর রান্না করতে তার একটুও ইচ্ছে করছে না। তার বেশ ঘুমও পাচ্ছে।

অগত্যা সে জল খেল এবং হুইস্কির বোতল খুলে বসল। আর কিছু না হোক, হুইস্কিতে ক্ষুধা-তৃষ্ণা অস্বাস্থ্যকর ভাবে ডুবিয়ে দেওয়া যায়।

রাত সাড়ে নটা নাগাদ ফোনটা বাজল।

একটা পুরুষ গলা গমগম করে উঠল, সর্বজিৎ সরকার আছে ?

বলছি।

শুয়োরের বাচ্চা, খানকির ছেলে, তোকে কী করব জানিস ? তোর ডান হাত কেটে নিয়ে কুত্তাকে খাওয়াব, তারপর তোর...

সর্বজিতের সামান্য নেশা হয়েছিল। সেটা অশ্লীল গালাগালের তোড়ে কেটে যাওয়ার জোগাড়। সে টেলিফোনটা রেখে দিল। অভিজ্ঞতাটা কিছু নতুন। তবে এরকম হতেই পারে। লোকটা হয়তো ইরার পক্ষের।

হুইস্কিটা তাকে খুব একটা হেলপ করছে না। খিদেটা মারার চেষ্টা ব্যর্থই হয়েছে। ভেসে উঠতে চাইছে অম্বল আর গ্যাস।

সর্বজিৎ হঠাৎ খেয়াল করল, বৃষ্টি থেমেছে। সে একটা

দুর্বল শরীরে উঠে পোশাক পরে বেরিয়ে কাছেই একটা ধাবায় গিয়ে হাজির হল। বহুকাল সে রেস্টুরেন্টে খায়নি। কেমন লাগবে কে জানে?

কিন্তু রুটি, তরকা এবং মাংসের চাঁপ শেষ অবধি তার খারাপ লাগল না। বরং পেট ভরে বেশ তৃপ্তি করেই খেল সে। ফিরে এসে ঘুমোল।

সকালবেলাটা বেশ লাগল তার। মেঘ ভেঙে চমৎকার রোদ উঠেছে। চারদিকটা ঝলমল করছে। এসব সকালে ছবি আঁকতে ইচ্ছে করে।

কলকাতায় খুব বেশি দিন থাকবে না সে। আজ প্রেস কনফারেন্সটা হলে কাল বা পরশুই রিখিয়ায় ফিরে যাবে। ঘটনাটা যা ঘটেছে তার সমাধান সহজ নয় বলেই তার মনে হচ্ছিল। সবাইকে বিশ্বাস করানো যাবে না যে, ছবিগুলো সে আঁকেনি।

সর্বজিৎ ফাঁড়ি পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে একটা দোকানে চা খেল। গরম সিঙ্গারা আর টাটকা জিলিপি খেল বহুদিন বাদে। দুপুরে ফের রেস্তোরাঁয় খেয়ে নেবে। ফিরে এসে সে একটা ক্যানভাস বিছিয়ে ছবি আঁকতে বসে গেল। অন্তত এই একটা ব্যাপারে ডুবে যেতে বেশি সময় লাগে না।

সর্বজিৎ একটা সময়ে টের পেল, সে একটা অদ্ভুত কিছু আঁকছে। প্যাটার্নটা এলোমেলো এবং হরেক রকমের চড়া রঙের ডট আর ড্যাশ। কিন্তু ছবির মাঝখান থেকে চারদিকে একটা বিকেন্দ্রিক প্রচণ্ড গতিময় শক্তির প্রকাশ ঘটছে। এটা কি তার এখনকার মনের অবস্থারই প্রতিফলন? নাকি শুধুই একটা খেয়ালখুশি? দরকার কি অত ভেবে? ছবিটা আঁকতে তো তার ভালই লাগছে।

মাঝে মাঝে এরকম আবোল তাবোল আঁকতে আঁকতে ছবিটা যেন হঠাৎ জীয়ন্ত হয়ে ওঠে এবং নিজেই নিজের সম্পূর্ণতার দিকে এগোয়। ছবিটা তখন আঁকিয়ের ওপর প্রভুত্ব করতে থাকে। আজ সর্বজিতের সেরকমই ভূতগ্রস্তের মতো অবস্থা। সে পাগলের মতো এঁকে যাচ্ছে। ডট-ড্যাশ,

ডট-ড্যাশ...

ফোনটা এল বেলা বারোটা নাগাদ। চমকে যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল সর্বজিৎ। বিরক্তির সীমাপরিসীমা থাকে না এ সময়ে কেউ বিরক্ত করলে।

তবু উঠে ফোনটা ধরল সে।

আমি শবর বলছি। কী করছেন ?

আঁকছিলাম।

বিকেল পাঁচটায় প্রেস কনফারেন্স, মনে আছে ?

আছে। যাব।

জয় শেঠ আপনার জন্য গাড়ি পাঠাবে।

ও কে।

কী আঁকছেন ?

আবোল তাবোল।

আঁকুন।

ফোন ছেড়ে দিল শবর।

দ্বিতীয় ফোনটা এল আধ ঘণ্টা বাদে। সর্বজিৎ কয়েকটা জায়গা একটু পরিবর্তন করছিল ছবিটার।

কে ?

শুনলাম তুমি নাকি বিল্টুর বাবা নও ?

সর্বজিৎ কিছুক্ষণ কে বিল্টু তা বুঝতেই পারল না, এমনকি নিজের স্ত্রীর কণ্ঠস্বরটাও নয়। একটু সময় লাগল বুঝতে। তারপর বলল, এসব কথা উঠছে কেন ?

উঠছে তুমি বলে বেড়াচ্ছ বলেই।

বলে বেড়াচ্ছি না। তদন্তের জেরায় পুলিশকে বলেছি।

কী বলেছ ? বিল্টু জারজ ?

তা ছাড়া আর কী ?

ইরার গলা হঠাৎ ফেটে পড়ল ফোনে, তোমার মুখ কেন খসে পড়ছে না বলো তো ? কেন তুমি গলায় দড়ি দাও না ? নিজের বউ মেয়েদের ন্যাংটো ছবি এঁকে বাজারে ছেড়েছ, নিজের ছেলের পিতৃত্ব অস্বীকার করে আমাকে চরিত্রহীন প্রমাণ করেছ, তোমার মতো নরকের কীট পৃথিবীতে আর

আছে কি ?

আমি মিথ্যে কথা বলিনি।

বলনি ? বলনি ? আজ থেকে দশ বছর আগে কী হয়েছিল তা তোমার মনে না থাকলেও আমার আছে।

কী মনে আছে ?

সে কথা আজ উচ্চারণ করতে ঘেন্না করে। আই ওয়ান্ট ইউ ডেড।

সেটা আমি জানি।

হয় তুমি মরবে, নয়তো আমি। তুমি যে বাতাসে শ্বাস নাও সে বাতাসে শ্বাস নেওয়াও আমার পক্ষে পাপ বলে মনে হয়। বাস্টার্ড। ইউ বাস্টার্ড।

ওসব ছবি আমি আঁকিনি, কে এঁকেছে জানি না। সেই কথাটা পাবলিককে জানাতেই আমার কলকাতায় আসা।

সারাটা জীবন তোমার অনেক ন্যাকামি দেখেছি। তোমার মতো জঘন্য মিথ্যেবাদীও দুটি নেই। এখন নিজের চামড়া বাঁচাতে মিথ্যে কথা তো তুমি বলবেই। কিন্তু তাতে আমাদের আর কী লাভ ? আমাদের যা ক্ষতি হওয়ার তা হয়েই গেছে।

ক্ষতি হয়েছে স্বীকার করছি। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারো ক্ষতিটা আমি করিনি। আরও একটা কথা, এসব ছবি কি আমার গৌরব বাড়িয়েছে ? বরং লোকে তো ছিঃ ছিঃ করছে।

তুমি নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করেছ। তোমার মতো নীচ মানুষের পক্ষে সবই সম্ভব।

ঠিক আছে, তুমি যা খুশি কল্পনা করে নিতে পার।

কল্পনা ? তোমার মতো বেজন্মাই ওকথা বলতে পারে। যারা ছবি বোঝে, জানে তারাই বলেছে এ সব ছবি তোমারই আঁকা, এত পাপ আর বিকৃতি সর্বজিৎ সরকার ছাড়া আর কার চরিত্রে থাকবে ?

ঠিক আছে। আর কিছু বলবে ?

তোমার লেটেস্ট জঘন্য কাজ হল শবরের কাছে বিল্টুর পিতৃত্ব অস্বীকার করা। জিজ্ঞেস করি তোমার কি মানুষের

চামড়া নেই শরীরে ?

জিজ্ঞেস করাটা বাহুল্য, আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা কি তাতে পাল্টাবে ?

না, পাল্টাবে না। কিন্তু বিল্টু বড় হচ্ছে। তার কানে যখন একথা যাবে যে, তুমি তার বাবা নও বলে প্রচার করছ তখন তার কী ধারণা হবে এবং সে কীভাবে সুস্থ জীবন যাপন করবে ?

তা বলে যা সত্যি তা কি ঢেকে রাখতে পারি ?

কোনটা সত্যি ? তোমার পক্ষে কোনও গালাগালই যথেষ্ট নয়। কাজেই তোমাকে আর গালাগাল দিয়ে লাভ নেই। শুধু বলি, তোমার সত্যের চেহারাটা কী রকম তা কি তুমি নিজেও জানো না। দুনিয়াকে যা খুশি বোঝাও, কিন্তু তোমার নিজের কাছেও কি তুমি মিথ্যে ? কীসের ওপর ভর দিয়ে বেঁচে আছ তুমি ?

তুমি এখন উত্তেজিত, আমার কথা বুঝতে বা শুনতে চাইবে না। কিন্তু যদি শুনতে তা হলে আমারও কিছু বলার মতো কথা ছিল ?

সে তো মিথ্যে কথা। ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা।

একটা মানুষ সব কথাই মিথ্যে বলতে পারে কি ? দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মিথ্যেবাদীও পারে না।

ঠিক আছে, তোমার অজুহাত আমি শুনব, বলো।

মাথা ঠাণ্ডা করে শোনো। প্রথম কথা সুধাময়ের সঙ্গে তোমার কোনও রিলেশন আছে কি না তা আমার জানা নেই। যদি তোমাকে কলঙ্কিতই করতে চাই তা হলেও তোমার সঙ্গে সুধাময়কে জড়াব এমন নির্বোধ আমি নই। কারণ, সুধাময় এখনও আমার খুব ভাল বন্ধু এবং সে আমার সাহায্যকারী। তোমাকে অস্বীকার করতে পারি, কিন্তু সুধাময়কে নয়। সুধাময়কে পাবলিকলি অপমান করলে আমি একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারাব।

সেটা জেনে বুঝেই তো তুমি কাদায় নেমেছ।

না, নামিনি। তোমাকে বে-আব্রু করার ইচ্ছে থাকলে অন্য

কারও সঙ্গে তোমাকে জড়াতে পারতাম। কিন্তু এসব আমার মাথায় আসেনি। এ কাজ আমার নয়, আরও প্রমাণ আছে।

কী প্রমাণ ?

গত দু বছরের মধ্যে আমি একবারও রিখিয়ার বাইরে কোথাও যাইনি। তুমি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারো, গত দু বছর আমি একবারও কলকাতায় আসিনি।

তাতে কী প্রমাণ হয় ?

তাতে প্রমাণ নয়, অপ্রমাণ হয়।

তার মানে কী ?

আমি বান্টু সিং বা ডেভিডকে চিনি না। তাদের কখনও দেখিনি। তাদের নামও জানতাম না। অচেনা, অজানা দুটো ছেলের রিয়ালিস্টিক পোর্ট্রেট তো কল্পনা থেকে আঁকা যায় না।

তুমি মিথ্যে কথা বলছ। তুমি মেয়েদের পিছনে কাউকে লাগিয়েছ।

না ইরা, ইচ্ছে করলে তুমি শবরকে দিয়ে খোঁজ করাও। সে পুলিশের গোয়েন্দা। গত দু বছর আমার গতিবিধি সম্পর্কে তদন্ত করে সে তোমাকে সঠিক তথ্য দেবে। আমার কিছুই লুকোনোর নেই।

আমি বিশ্বাস করছি না।

তুমি যে আমার কোনও কথাই বিশ্বাস করবে না তা জানি। বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করবেই বা কেন ? রিখিয়ার স্থানীয় মানুষজন আমাকে রোজই দেখে। আমার কাজের লোক, দুধওয়ালা, প্রতিবেশী সকলেই সাক্ষি দেবে। গত দু বছর আমি তোমাদের কোনও খবরই রাখিনি। কী করে জানব মেয়েরা কার সঙ্গে মিশছে ?

ঠিক আছে, খবর নেব। কিন্তু তাতেও যে তোমার ষড়যন্ত্র ধরতে পারব তা মনে হয় না। তুমি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিলে। তুমি সব করতে পার।

তবু খবর নাও। ঘটনাটা কী তা বুঝতে সময় লাগবে। চট করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে যেও না।

ইরা ফোন ছাড়ল।

রিখিয়ার জলে গ্যাস বা অম্বল বিশেষ হয় না। কিন্তু কলকাতার জলে হয়। সকালের জিলিপি আর সিঙ্গারায় এখন বেশ অম্বল টের পাচ্ছে সর্বজিৎ। অস্বস্তি হচ্ছে। সে দুটো অ্যান্টাসিড খেয়ে নিল।

ছবিটা নিয়ে ফের বসল সে এবং টের পেল, ছবিটা শেষ করার তাগিদ আর ভিতরে নেই। সে নিবে গেছে। কিন্তু ছবিটা হচ্ছিল খুব ভাল।

সে ছবিটার সামনে চুপ করে বসে রইল খানিকক্ষণ।

আবার ফোন এল।

শুয়োরের বাচ্চা, খানকির বাচ্চা, তোর...

ফোনটা নামিয়ে রাখল সে। উত্তেজিত হল না। লাভ কী?

এসব গালাগাল তার জন্য প্রেস ক্লাবেও অপেক্ষা করছিল। বিকেল পাঁচটার কয়েক মিনিট আগে জয় শেঠের সঙ্গে সে যখন পৌঁছল তখন ভিড়ে ভিড়াক্কার প্রেসক্লাবের পিছনের হলঘরটায় ঢোকাই যাচ্ছিল না। ঠেলেঠুলে যখন শবর তাকে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে তখনই ভিড়র ভিতর থেকে কে যেন গালাগালগুলো দিতে শুরু করল।

সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য একজন মারমুখো চেহারার কর্মকর্তা মাইক টেনে নিয়ে গর্জন করে উঠলেন, খবর্দার। কোনও খারাপ কথা বললে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হবে। অ্যাই রথীন, দেখো তো কে কথাগুলো বলল। ধরে নিয়ে এসো।

সঙ্গে সঙ্গে সভাস্থল চুপ করে গেল। গালাগালকারীকে অবশ্য খুঁজে পাওয়া গেল না।

আজকের কনফারেন্সে মধ্যস্থ হিসেবে প্রবীণ শিল্পী মনুজেন্দ্র সেনকেও হাজির করা হয়েছে। সর্বজিতের পাশেই বসা। বললেন, কেমন আছ সর্বজিৎ?

ভাল থাকার কি কথা দাদা?

হ্যাঁ, কী যে সব হচ্ছে বুঝতে পারছি না।

আমিও পারছি না।

প্রেস কনফারেন্সের শুরুতে সেই মারমুখো কর্মকর্তা একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দিয়ে বললেন, সর্বজিৎ সরকারের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ উঠেছে তিনি তার জবাব দিতে এসেছেন। মনে রাখবেন এটা প্রেস কনফারেন্স। কোনওরকম চেঁচামেচি বা গালাগাল বরদাস্ত করা হবে না। পরিবেশের গাম্ভীর্য ও মর্যাদা যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় আশা করি আপনারা তার দিকে লক্ষ রাখবেন।

কর্মকর্তাটি কে তা বুঝতে পারল না সর্বজিৎ। তার সন্দেহ হল, লোকটি পুলিশের কেউ হতে পারে।

প্রথমেই সর্বজিৎকে কিছু বলতে বলা হল। তারপর প্রশ্ন।

সর্বজিৎ শরীরটা ভাল বোধ করছে না। অম্বলটা তীব্রতর হয়েছে। মানসিক ভারসাম্যও যেন থাকছে না। অস্বাভাবিক একটা ঝিমঝিম ভাব মাথাটা দখল করে আছে।

সর্বজিৎ খুব শান্ত গলায় বলল, যে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে তার জন্য আমাকে দায়ী করা হচ্ছে। আমি কলকাতা থেকে অনেক দূরে থাকি। খবরটবর বিশেষ পাই না। অনেক দেরিতে আমি জানতে পেরেছি যে, আমার পরিবারকে হেয় এবং আমাকে অপদস্থ করার জন্য কেউ কতগুলো বিচ্ছিরি ছবি এঁকেছে এবং তা কলকাতায় দেখানোও হয়েছে। আমি সুস্পষ্টভাবে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে জানাতে চাই এগুলো কোনও অসৎ ও পাজি লোকের কাজ। ছবিগুলো আমার আঁকা নয়, আঁকার প্রশ্নই ওঠে না। আশা করি পুলিশ এ বিষয়ে সঠিক তদন্ত করে কালপ্রিটকে খুঁজে বের করবে।

বিখ্যাত এক ইংরিজি দৈনিকের সাংবাদিক প্রশ্ন করল, আপনার আঁকা নয় সে তো বুঝলাম, কিন্তু দি পেইন্টার মাস্ট বি এ ক্লোজ পারসন অফ ইওর ফ্যামিলি। সো ইউ মাস্ট নো হিম।

না, আমি জানি না।

একজন তরুণ সাংবাদিক বলে উঠল, বিশেষজ্ঞরা বলছেন

এ ছবির স্টাইল অবিকল আপনার মতো।

তা হতেই পারে। লোকটা হয়তো ভাল নকলনবিস।

আপনার কি নিজের ফ্যামিলির সঙ্গে ফিউড আছে?

না। থাকলেও সেটা পারিবারিক ব্যাপার।

আর একজন সাংবাদিক বলল, পারিবারিক ব্যাপারকে তা হলে পাবলিক করলেন কেন?

আপনারা কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না? ছবিগুলো আমার আঁকা নয়। আমি গত দু বছর কলকাতায় আসিনি।

তাতে কী প্রমাণ হয়?

ছবিতে যে দু'টি ছেলের চেহারা আপনারা দেখেছেন তাদের আমি কখনও দেখিনি।

ওটা বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি হল না।

পরে একজন বলল, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আপনার ঝগড়া আছে বলে শোনা যাচ্ছে। ঝগড়াটা পুরনো। আপনার স্ত্রীর ধারণা আপনি তাঁকে পাবলিকলি অপমান করার জন্যই ছবিগুলো এঁকেছেন।

না। আমি এত নীচ নই।

এবার হঠাৎ কর্মকর্তাদের একজন বলে উঠল, নববাবু, আপনি কিছু বলবেন?

নব দাস উঠে দাঁড়াল। সেই নব দাস, যাকে একবার রেগে গিয়ে মেরেছিল সর্বজিৎ। নবর চুলে একটু পাক ধরেছে, শরীরে জমেছে একটু চর্বি। আর সব ঠিকই আছে।

নব দাস অনুত্তেজিত গলায় বলল, সর্বজিৎ সরকার বলছেন যে, ছবিগুলো ওঁর আঁকা নয়। এটা প্রমাণ করার খুব সহজ উপায় আছে। পুলিশের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টরা যদি সাহায্য করে তবে সমস্যার সহজ সমাধান হতে পারে। আর্টিস্টকে তার পেইন্টিং হ্যান্ডেল করতেই হয়। আমার ধারণা অয়েলে আঁকা ছবির জমিতে কোনও না কোনও ভাবে আর্টিস্টের ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যাবেই। ওই সব জঘন্য ছবিতে সর্বজিৎ সরকারের ফিঙ্গারপ্রিন্ট খুঁজে দেখা হোক।

সঙ্গে সঙ্গে একটা সমবেত গুঞ্জনধ্বনি উঠল ঘরের মধ্যে।

নব দাস বলল, সর্বজিৎ সরকার কি রাজি ?

হ্যাঁ, রাজি ।

তা হলে আমরা পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব যে তারা ছবিগুলো বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করান ।

নব দাস বসে পড়ল ।

একজন অবাঙালি সাংবাদিক ভাঙা বাংলায় বলল, আই অ্যাম হিয়ার টু কংগ্র্যাচুলেট ইউ মিস্টার সরকার । আই থট ইউ হ্যাভ শোন গ্রেট কারেজ ইন দোজ পেইন্টিংস । বাট ইফ দোজ আর সাবস্টিটিউটস দেন দ্যাট ইজ অ্যানাদার ম্যাটার ।

সর্বজিৎ মৃদু হেসে বলল, আই অ্যাম নট দ্যাট কারেজিয়াস ।

ও কে স্যার, থ্যাংক ইউ ।

আরও একজন হিন্দি সাংবাদিক উঠে ভাঙা বাংলায় বলল, স্যার, আপনার কি মনে হয় নিজের ফ্যামিলির ন্যুড আঁকা খারাপ কাজ ?

আমি ওসব জানি না ।

আর ইউ এ মর‍্যালিস্ট ?

তাও বলতে পারি না ।

আর্টিস্টদের কি মর‍্যাল থাকা উচিত ?

কেন নয় ?

আমরা তো মনে করি, আর্টিস্টদের কোনও সংস্কার থাকবে না ।

এ ব্যাপারে আমার কিছু বলার নেই ।

আপনি সমর্থন করেন না ?

হয়তো সব সংস্কার মানি না । কিন্তু কিছু ভ্যালুজ তো মানতে হয় ।

আর্টের ভ্যালুজ কি আলাদা নয় ?

আমি অত কথা বলতে পারব না ।

আমি তো মনে করি ইউ হ্যাভ ডান এ কারেজিয়াস থিং । ইন ফ্যাক্ট আই কেম হিয়ার ফ্রম দিল্লি জাস্ট টু শেক ইওর হ্যান্ডস ।

এবার একজন বাঙালি সাংবাদিক পিছন থেকে বলল, আপনি ভয় পেয়ে সবকিছু অস্বীকার করছেন না তো ?

না। ভয় কিসের ?

মিস্টার সিংঘানিয়া কিন্তু আপনার এজেন্টের কাছ থেকেই ছবিগুলো কিনেছেন। আপনার এজেন্টও বলছে, ছবিগুলো তারা আপনার কাছ থেকেই পেয়েছে। ফিঙ্গারপ্রিন্টের একটা কথা উঠেছে বটে, কিন্তু সেটা খুব নির্ভরযোগ্য অজুহাত নয়। একজন আর্টিস্ট দূরদর্শী হলে ফিঙ্গারপ্রিন্ট যাতে ছবিতে না ওঠে তার ব্যবস্থা করে রাখবে।

সর্বজিৎ অসহায়ভাবে বলল, এর চেয়ে বেশি আমার আর কিছু করার নেই।

আপনার স্ত্রী বা মেয়েরা প্রেস কনফারেন্সে এলেন না কেন ?

তারা কেন আসবে ?

আমরা তাদের বক্তব্যও শুনতে চাই।

আপনারা তাদের অ্যাপ্রোচ করে দেখতে পারেন।

ওকে। আমরা মিস্টার সিংঘানিয়া আর জয় শেঠকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই।

রিপোর্টারদের ভিড়ের মধ্যেই মোটাসোটা, ফর্সা, আহ্লাদী চেহারার সিংঘানিয়া বসে ছিল। উঠে এল মাইকের সামনে। হাতজোড় করে বলল, আমি কোনও ভি আই পি নই। সামান্য ব্যবসায়ী। আমার কয়েকটা কারবার আছে। আর্টও একটা। গুড মার্কেট, গুড মানি। কোনও দু' নম্বরি ব্যাপার নেই। ক্লিন পারচেজ।

সেই বাঙালি ঠাণ্ডা-মাথার রিপোর্টার প্রশ্ন করল, মেনি ফেসেস অফ ইভ সিরিজের ছবিগুলি আপনি কবে কিনেছেন এবং কার কাছ থেকে ?

এভরিবডি নোজ। দেড় বছর আগে মিস্টার শেঠ-এর কাছ থেকে কিনি।

আপনি সর্বজিৎ সরকারের অনেক ছবি কিনেছেন কি ?

হ্যাঁ। মিস্টার সরকারের বাজার ভাল।

আপনি তাঁর ছবি দেখেই বলে দিতে পারবেন যে সেটা মিস্টার সরকারের আঁকা ?

নিশ্চয়ই পারব।

ইভ সিরিজ সম্পর্কে বলতে পারবেন ?

পারব। ছবি মিস্টার সরকারের আঁকা বলেই জানি। আর আমি ছবিগুলো তাঁর নাম করেই বিক্রি করব, যতক্ষণ না প্রমাণ হচ্ছে যে এসব ওঁর আঁকা নয়। আমার আর কিছু বলার নেই। আই অ্যাম এ হার্ট পেশেন্ট। প্লিজ স্পেয়ার মি।

জয় শেঠ বলল, আমরা মিস্টার সরকারকে সম্মান করি। হি ইজ নাইস টু আস।

এই ছবিগুলো কীভাবে আপনাদের হাতে আসে ?

পিতাজি রিখিয়ায় গিয়ে নিয়ে এসেছিলেন।

প্যাক করে আনা হয়েছিল কি ?

হ্যাঁ। পিতাজি প্যাকার নিয়েই যান।

আপনি তো শুনলেন সর্বজিৎ সরকার বলছেন উনি এসব আঁকেননি।

শুনলাম। বাট উই আর অ্যাট এ লস।

ছবির ব্যাপারে আপনাদের সিকিউরিটি কেমন ?

খুব ভাল। পেইন্টিংস আর কস্টলি থিং। সো উই টেক কেয়ার।

নকল ছবি ঢুকে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই বলছেন ?

নো স্যার।

পুলিশ কি আপনাদের গোডাউন বা স্টোর দেখেছে ?

হ্যাঁ স্যার।

তারা কী বলছে আমরা জানতে চাই।

সেই মারমুখো কর্মকর্তা উঠে বলল, পুলিশের বক্তব্য এখন নয়। তদন্ত চলছে। এখনও সব অ্যাঙ্গেল দেখা হয়নি।

সাংবাদিকটি জয় শেঠকে বলল, মিস্টার শেঠ, আপনি কি বলতে চান সর্বজিৎ সরকার মিথ্যে কথা বলছেন ?

নো স্যার। নট দ্যাট।

তা হলে কী বলতে চান স্পষ্ট করে বলুন।

আমরা মিস্টার সরকার এবং আরও অনেকের পেইন্টিংস কিনি। উই হ্যাভ আদার এজেন্টস। সো দেয়ার মে বি এ মিক্স আপ অ্যান্ড মে বি এ সাবস্টিটিউশন মেড বাই সাম ওয়ান।

সেটা কী করে সম্ভব ?

জয় শেঠ মাথা চুলকে বলল, এরকম হতে পারে কেউ এই সব ছবি এঁকে আমাদের স্টোরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

তা হলে তো বলতে হবে আপনাদের স্টোর ফুল প্রুফ নয়।

ফুল প্রুফ নয় সে কথা ঠিক। এই ঘটনার পর আমরা আরও সাবধান হয়েছি।

আপনারা কি সর্বজিৎ সরকারের ফ্যামিলি মেম্বারদের চেনেন ?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

আপনারা যখন দেখলেন ছবিগুলো ওঁর ফ্যামিলি মেম্বারদের নিয়ে আঁকা তখন আপনারা সেটা ওঁকে বা ওঁর পরিবারকে জিজ্ঞেস করলেন না কেন ?

আমরা তো ভেবেছি যে মিস্টার সরকারেরই আঁকা। উই ডোন্ট আস্ক এনি আর্টিস্ট অ্যাবাউট দেয়ার পেইন্টিংস।

মিস্টার সরকারের যে সব ছবি আপনারা কেনেন তার হিসেব আপনাদের নিশ্চয়ই আছে ?

সিওর ?

গত দু' বছরে আপনারা সর্বজিতের ক'টা ছবি কিনেছেন ?

তেরোটা।

তার মধ্যে দশটা ইভ সিরিজ ?

হ্যাঁ।

তেরোটাই বিক্রি হয়ে গেছে ?

না। তিনটে আছে।

এবার মিস্টার সরকারকে প্রশ্ন করব, আপনার হিসেবও কি তাই বলে ? দেড় বছরে শেঠদের আপনি তেরোটা ছবি দিয়েছেন ?

হ্যাঁ।

আপনার কথায় তেরোটার মধ্যে দশটা ছবি নিশ্চয়ই ইভ সিরিজ নয় ?

না।

তা হলে আপনার হিসেব অনুযায়ী আপনার দশটা ছবি মিসিং।

তাই তো দাঁড়াচ্ছ।

সেই দশটা ছবি কী নিয়ে আঁকা মিস্টার সরকার ?

প্রকৃতি, ল্যান্ডস্কেপ, গাছপালা, দেহাতি মানুষ এইসব।

স্পেসিফিক বলতে পারবেন না ?

তাও পারব। আমার নোট করা থাকে।

শেঠরা কতদিন পর পর আপনার ছবি আনতে যায় ?

বছরে একবার বা দুবার।

বছরে আপনি ক'টা ছবি আঁকেন ?

দশ বারোটা তো বটেই। বেশিও আঁকি।

সেটা কি খুব বেশি ?

না। কারণ ওখানে আমার অখণ্ড অবসর। কাজেই একটু বেশিই আঁকতে পারি।

আপনি কি শুধু তেলরঙে আঁকেন ?

তেল বা অ্যাক্রিলিক।

ছবি আঁকার আগে স্কেচ বা আউটলাইন করে নেন ?

সব সময়ে নয়।

আপনি কখনও অর্ডারি ছবি আঁকেন ? ধরুন কারও পোর্ট্রেট আঁকার অফার পেলে ? ফি যদি ভাল হয় ?

আঁকি। তবে রিখিয়ায় যাওয়ার পর আর হয় না।

অফার পাননি ?

পেয়েছি। কিন্তু রিফিউজ করেছি।

আপনি এই স্ক্যান্ডালটা নিয়ে আর কিছু বলবেন ?

না।

সভা ভেঙে গেল।

বেরিয়ে এসে যখন গাড়িতে উঠে বসল সর্বজিৎ তখন

কোথা থেকে এসে তার পাশে বসে পড়ল শবর। জয় গেল সামনে, ড্রাইভারের পাশে।

শবর, কেমন হল আজকের কনফারেন্স ?

সো সো। উত্তেজিত হননি বলে ধন্যবাদ।

তোমাকে একটা কথা জানানো হয়নি। টেলিফোনে কে যেন মাঝে মাঝে আমাকে গালাগাল করছে।

তাই ? তবে এ রকম তো এখন হতেই পারে।

ইরা আজ ফোন করেছিল।

কী কথা হল ?

আমি বললাম যা বলার। বিশ্বাস করল না।

না করারই কথা।

শবর, আমার মনে হয় কলকাতায় থাকার কোনও মানে হয় না। এখানে এসেই আমি টায়ার্ড আর অসুস্থ ফিল করছি। কাল যদি ফিরে যাই কেমন হয় ?

আপনার আর কয়েকটা দিন থাকার দরকার।

কেন বল তো ?

ফর সাম রেফারেন্সেস অ্যান্ড সাম হেল্প্।

তাতে কিছু হবে ?

দেখাই যাক না।

আর একটা কথা। বিল্টু আমার ছেলে নয়, এ কথাটা তোমাকে বলেছিলাম। তুমি সেটা কেন যে ইরাকে বললে ?

কথাটা পাশ কাটিয়ে শবর বলল, কাল ছবিগুলো দেখতে যেতে হবে।

পেইন্টিংগুলো হোটেলের ঘরে চারদিকে সাজিয়ে রেখেছিল সিংঘানিয়া। সকালের আলোয় বেশ ঝলমল করছিল ছবিগুলো।

শবর বলল, দেখুন বাট ডোন্ট টাচ এনিথিং।

সিংঘানিয়া হেসে বলল, 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট ? ইয়েস ইউ মাস্ট বি কেয়ারফুল।

সর্বজিৎ ছবিগুলো একাগ্র চোখে দেখে যাচ্ছিল। খুবই ভাল জাতের পোর্ট্রেট। বিদেশি রঙে এবং তুলিতে আঁকা, যে

এঁকেছে সে পাকা শিল্পী। নকল বলে চেনাই যায় না। হ্যাঁ, সর্বজিতের কিছু বৈশিষ্ট্য এই সব ছবিতেও আছে।

আর ইউ প্লিজড মিস্টার সরকার ?

আমার প্লিজড হওয়ার কারণ কী ?

দিজ আর গুড পেইন্টিংস স্যার।

হতে পারে। বাট আই অ্যাম ওরিড।

কেন স্যার ?

দি ইম্পস্টার ইজ এ গুড পেইন্টার।

ইম্পস্টার হোক কি না হোক, রিসেন্ট কন্ট্রোভার্সি হ্যাজ মেড দি পেইন্টিংস এক্সট্রিমলি ভ্যালুয়েবল। গতকাল রাতে ওভার টেলিফোন আমি বম্বে থেকে বিগ অফার পেয়েছি।

কত বিগ ?

দ্যাট ইজ ট্রেড সিক্রেট স্যার।

তার মানে ছবিগুলো আপনি হাতছাড়া করছেন না ?

নো স্যার। আই অ্যাম এ বিজনেসম্যান। তবে চিন্তা করবেন না। বোম্বাই দিল্লিতে আপনার ফ্যামিলিকে তো কেউ চেনে না।

কিন্তু পাবলিসিটি হ্যাজ রিচড দোজ সিটিজ। নইলে আপনি বিগ অফার পেতেন কি ?

ঠিক কথা। কিন্তু পাবলিক স্ক্যান্ডাল হবে না। কালেক্টর জানবে তো জানুক। চা, কফি কিছু খাবেন স্যার ?

না, থ্যাংক ইউ।

সিংঘানিয়া শবরকে বলল, আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টরা কখন আসবে স্যার ?

বেলা এগারোটায়।

আফটার দ্যাট মে আই প্যাক মাই পেইন্টিংস ?

হ্যাঁ।

আমি কাল বম্বে চলে যাব। বুঝতেই পারছেন আমার সময় নেই।

ঠিক আছে মিস্টার সিংঘানিয়া।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে শেঠদের দেওয়া গাড়িতে

চেপে সর্বজিৎ বলল, তা হলে তুমি সিংঘানিয়াকে ছেড়ে দিচ্ছ ?

শবর একটা শ্বাস ফেলে বলল, উপায় কী ?

আমার নামেই ছবিগুলো চালু থাকবে ?

আপাতত। যদি প্রমাণ হয় যে আপনার আঁকা নয় তা হলে অন্য কথা। সে ক্ষেত্রে সিংঘানিয়া হয়তো আপনার নামের স্বাক্ষর ছবি থেকে মুছে দেবে।

হুঁ। ঠেকাতে পার না ?

না, কোন আইনে ঠেকাব ?

আইন আমি জানি না, তোমারই জানবার কথা।

হয়তো তাই। এই কেস তো আগে পাইনি। এই প্রথম।

শবর, আমি জানি তুমি একজন দুর্দান্ত পুলিশ অফিসার।

যতটা শোনেন ততটা নয়।

তোমার বুদ্ধি ক্ষুরধার আমি জানি। তুমি কিছু আঁচ করতে পারছ না ?

না।

কেন পারছ না শবর ?

ব্যাপারটা জটিল।

কাউকে সন্দেহ হচ্ছে না ?

এখনও নয়।

আমিও কেমন ধাঁধায় পড়ে গেছি।

ভাববেন না। কয়েকটা দিন দেখা যাক।

আমাকে কত দিন থাকতে হবে এখানে ?

থাকুন না কয়েকদিন।

আমি এখানে হাঁপিয়ে উঠছি।

জানি। ছবি আঁকছেন ?

আঁকছি। ছবিই তো বাঁচিয়ে রাখে।

একটা কথা বলবেন ?

কী কথা ?

আপনি কলকাতায় যাদের ছবি আঁকা শেখাতেন তাদের

মধ্যে কেউ কি শত্রুতা করতে পারে ?

কী করে বলব ?

এনি হান্‌চ্‌ ?

না শবর। নো হান্‌চ।

শবরের ভ্রূ কুঁচকে রইল।

নিশুত রাত। হঠাৎ দরজায় বিশাল খট খট শব্দ হল। তার পর তীব্র ধাক্কা।

সর্বজিৎ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, বাঁচাও!

কেন চেঁচাল তা সে জানে না। বড্ড ভয়। দরজাটা ভীষণভাবে ধাক্কা দিচ্ছে কেউ।

মটাৎ করে ছিটকিনি ভেঙে দরজা খুলে গেল।

সভয়ে চেয়ে সর্বজিৎ বলল, তুমি!

হ্যাঁ আমি।

কেন এসেছ ?

হাতে এটা কী দেখছ ?

ওঃ ওটা তো—

কী মনে হচ্ছে তোমার ?

সর্বজিৎ আতঙ্কের গলায় বলল, এ রকম কোরো না প্লিজ—

কেন, আমার ফাঁসি হবে ?

হ্যাঁ।

হবে না। সবাই তোমার মৃত্যু চায়, তা জান ?

মারবে কেন ? মেরো না।

মাঝে মাঝে মরতে হয়। মরো।

তার পরই উপর্যুপরি কয়েকবার ঝলসে উঠল চপারটা। সর্বজিৎ অবাক হয়ে দেখল তার শরীরের অনেকগুলি ক্ষতস্থান থেকে নানা বর্ণের রং বেরিয়ে আসছে। নীল, হলুদ, সাদা, সবুজ, কালো, লাল। রক্তের রং কি এরকমই ?

সর্বজিৎ কি মরে যাচ্ছে ? সর্বনাশ! মরে যাচ্ছে নাকি ?

ঘুম ভেঙে মধ্যরাতে ধড়মড় করে উঠে বসে সর্বজিৎ।

॥ তিন ॥

সিংঘানিয়া রোজ সকাল চারটেয় ওঠে। তার অ্যালার্মের দরকার হয় না। ছেলেবেলার অভ্যাস। ঠিক চারটেয় তার ঘুম ভাঙবেই। উঠে পরিষ্কার পরচ্ছিন্ন হয়ে পুজোয় বসে। নিরেট সোনার তৈরি পাঁচ ইঞ্চি লম্বা গণপতি মূর্তিটি তার সঙ্গেই থাকে।

পুজো সেরে একটু ফলের রস খেয়ে সে বেড়াতে বেরোয়। ডাক্তার বলেই দিয়েছে দুবেলা খানিকটা হাঁটতেই হবে। সিংঘানিয়ার দুজন সহকারী এবং দুজন দেহরক্ষী দু'পাশের ঘরে থাকে। সিংঘানিয়া কোথাও গেলে তারা ঘর পাহারা দেয়। চারজনই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রক্ষী। চারজনই স্বাস্থ্যবান এবং বুদ্ধিমানও। গণপতি কখনও যোগ্য লোক ছাড়া নেয় না। পাহারা দেওয়ার মতো তার অনেক কিছু আছে।

সিংঘানিয়ার একজন পঞ্চম পাহারাদারও আছে। সে হল বিশাল ডোবারম্যান কুকুর ডোরা। সেও হোটেলেরই ঘরে থাকে, সহকারী দুজনের সঙ্গে।

ডোরা প্রভুভক্ত কুকুর। সকালে সিংঘানিয়ার সঙ্গে সেও বেড়াতে যায়। সরু কিন্তু শক্ত চেন দিয়ে বেঁধে তবেই তাকে নিয়ে বেরোয় সিংঘানিয়া। ডোরা কিলার ডগ।

সকালে কলকাতার রাস্তায় তেমন গাড়ি-ঘোড়া নেই।

হোটেল থেকে ময়দানের দূরত্ব বেশি নয়। গাড়ি নেওয়ার দরকার হয় না। সিংঘানিয়া নাতিদ্রুত হাঁটতে হাঁটতে ময়দানে পৌঁছে গেল। ডোরা একটা গাছের তলায় প্রাতঃকৃত্য সেরে নেওয়ার পর সিংঘানিয়া কুকুরটার সঙ্গে একটা রবারের বল নিয়ে খানিকক্ষণ খেলা করল। একটু জিরিয়ে নিয়ে ফের জোর-কদমে হাঁটা।

গুড মর্নিং মিস্টার সিংঘানিয়া।

মর্নিং।

কেমন আছেন।

গুড। ভেরি গুড।

সঙ্গে কুকুর কেন?

বেড়াতে নিয়ে এসেছি।

বাঃ বেশ ভাল।

হ্যাঁ ভাল।

তা হলে ভালই আছেন?

ভেরি গুড। ভেরি ভেরি গুড।

সামনে শর্টস আর কামিজ-পরা একজন হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা হাতে পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করল।

সিংঘানিয়া অবাক হয়ে বলল, এ কী? মাগিং নাকি?

না মাগিং নয় সিংঘানিয়া।

তা হলে পিস্তল দিয়ে কী করবেন?

আই শ্যাল কিল ইউ।

কেন, আমি কী করেছি? আমি তো—

কথাটা শেষ হল না সিংঘানিয়ার। উপর্যুপরি এবং দ্রুত দুটি গুলি তাকে ছ্যাঁদা করে দিল বুকে।

সিংঘানিয়া পড়ে যাচ্ছিল। কুকুরটা দুটি চিৎকার দিতেই তার মাথা ভেঙে গেল শক্তিশালী বুলেটে।

তার পর ময়দানের ঘাসে দুটি মৃতদেহ পড়ে রইল। একজন মানুষ ও একটি কুকুরের।

সকাল সাড়ে আটটায় ফোনটা পেল সর্বজিৎ।

আমি শবর বলছি।

বলো।

কী করছিলেন?

ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে এলাম দোকান থেকে। এবার চা খাব।

বেশ বেশ। কখন উঠলেন ঘুম থেকে?

এই তো, সাড়ে ছটা সাতটা হবে।

রিখিয়াতে তো আরও সকাল ওঠেন।

হ্যাঁ। মর্নিং ওয়াক করতে যাই।

কলকাতায় সেটা হচ্ছে না বুঝি ?

নাঃ। কলকাতায় হাঁটব কোথায় ? তার ওপর বৃষ্টি বাদলায় পথঘাট তো যাচ্ছেতাই।

আচ্ছা, বছর পাঁচেক কি তারও আগে আপনি একটা স্মল আর্মসের লাইসেন্স পেয়েছিলেন কি ?

কেন বলো তো ?

জাস্ট কৌতূহল।

হ্যাঁ। রিখিয়াতে থাকাটা কতখানি বিপজ্জনক সেটা আন্দাজ করতে না পেরে লাইসেন্স নিয়েছিলাম। পিস্তলও একটা কিনি।

পিস্তল না রিভলভার ?

পিস্তল। ওয়েম্বলে।

কত বোর ?

পয়েন্ট বত্রিশ।

সেটা কোথায় ?

আমার স্যুটকেসেই থাকে।

স্যুটকেসটা কোথায় ?

আমার কাছে।

আর একটা কথা।

বলো।

আপনার স্ত্রীরও একটা রিভলভার থাকার কথা।

হ্যাঁ। আছে। ওটার জন্য তুমিই লাইসেন্স বের করে দিয়েছিলে।

সেইজন্যেই জিজ্ঞেস করছি, রিভলভার কি উনি কিনেছিলেন ?

অফ কোর্স। বাড়িতে ক্যাশ টাকা থাকে বলে কিনেছিল।

সেটা কি লুগার ?

তা হবে। হ্যাঁ, লুগারই। পয়েন্ট বত্রিশ বোর।

বেশ, এবার কাজের কথা।

বলো।

আমি টেলিফোনটা ধরে আছি, আপনি উঠে গিয়ে স্যুটকেসটা খুলে দেখুন পিস্তলটা আছে কিনা।

কেন বলো তো।

দেখুন না।

সর্বজিৎ উঠে গিয়ে স্যুটকেস খুলল। কেনার পর জিনিসটা পড়েই আছে। দু তিনবার ফাঁকা মাঠে গুলি চালিয়েছিল সে। সেটাকে উদ্বোধন বলা যায়। তার পর কাজে লাগেনি। স্যুটকেস হাঁটকাতে হল কম নয়। একেবারে তলার দিকে প্লাস্টিকে মোড়া জিনিসটা পাওয়া গেল।

ফিরে এসে ফোন তুলে সে বলল, হ্যাঁ, আছে। কিন্তু কী হয়েছে শবর ? আমি কাউকে খুনটুন করলাম নাকি ?

কেউ কাউকে করেছে। ব্যাড নিউজ।

কে কাকে খুন করল শবর ?

কে তা জানি না। তবে কাকে তা জানি।

প্লিজ কাম আউট। আমার ফ্যামিলির কেউ কি ?

আরে না।

তা হলে ?

সিংঘানিয়া।

বল কী ? কখন ?

আজ সকালে। ময়দানে। ডিউরিং হিজ মর্নিং ওয়াক।

সর্বনাশ।

সঙ্গে একটা ডোবারম্যান কুকুর ছিল, সেটাও মরেছে।

গুলি নাকি ?

হ্যাঁ। খুব ক্লোজ রেঞ্জ থেকে। সিংঘানিয়ার হীরের আংটিটাও নেই।

তুমি কি আমাকে সন্দেহ করছ ?

না। তবে আপনার অ্যালিবাইটা পোক্ত হওয়া দরকার।

অ্যালিবাই ?

হ্যাঁ, সকালে ঠিক কখন উঠেছেন ভেবে বলুন।

ভেবেই বলছি। ভাবতে দাও। ...ছটা বেজে চল্লিশ মিনিট হবে।

আপনি আর্লি রাইজার, আজ এত দেরি হল কেন ?

রিখিয়ায় তো প্রায় ভর সন্ধেবেলাই শুয়ে পড়তে হয়। রাত নটায়। এখানে তা হয় না। এ সব কাণ্ডের ফলে মাথা গরম হয়ে ঘুম আসতে দেরি হয়েছিল।

ঘুম থেকে উঠে কী কী করেছেন ?

নাথিং টু টেল অ্যাবাউট। টয়লেটে গেছি, স্নান করেছি। একটু জানালার ধারে বসে থেকেছি। তারপর চা আনতে বেরলাম।

ব্যস ? আর কিছু নয় তো ?

না।

কোনও সাক্ষি আছে ?

সাক্ষি ? সাক্ষি কে থাকবে ? ফ্ল্যাটে তো আর কেউ নেই।

দারোয়ান গোছের কেউ ?

একজন দারোয়ান আছে ঠিকই। কিন্তু সে আমাকে কতদূর চেনে কে জানে। চিনতেও পারে।

ঠিক আছে। দরকার হলে তাকে জেরা করা যাবে।

শোনো শবর, সিংঘানিয়া আমার একজন পোটেনশিয়াল বায়ার। তাকে মারলে আমার প্রভূত ক্ষতি।

একদিকে ক্ষতি হলে অন্য দিকে লাভ।

কীসের লাভ ?

ছবিগুলো এবার হয়তো কিনে নিতে পারবেন।

কিনে আর কী লাভ ? বাজারে চাউর হয়ে গেছে।

তবু তো কিনতে চেয়েছিলেন।

হ্যাঁ। তখন বিবেচনাটা কাজ করেনি।

এখন করছে ?

করছে।

আরও একটা খবর আছে।

কী খবর ?

ছবিগুলো সিংঘানিয়ার ঘর থেকে চুরি গেছে।

বল কী ?

ঠিকই বলছি।

ছবির জন্যই মার্ডার।

তাই তো মনে হচ্ছে। আপনার দ্বিতীয় পিস্তল নেই তো।

না না। একটাই কাজে লাগে না।

সিংঘানিয়া খুন হয়েছে বত্রিশ বোরের বুলেট ?

তার মানে সন্দেহের আঙুল এখন আমার দিকে ?

যা ভাববার ভাবতে পারেন।

আর যে-কেউ সন্দেহ করুক, তুমি কোরো না।

সন্দেহের অভ্যাসটা ছাড়তে চায় না সহজে।

আমাকে কী করতে বলো তুমি ?

কিছু না। চুপচাপ থাকুন। সিংঘানিয়ার ছবি পাহারা দেওয়ার জন্য চার জন লোক ছিল।

তবু চুরি ?

হ্যাঁ। একজন বেয়ারাগোছের লোক এসে খবর দেয় যে সাহেব ময়দানে খুন হয়েছে। ওরা চারজন দৌড়োয়। সেই ফাঁকে—

ওঃ।

মজা কী শুনবেন ?

বলো।

যখন খবরটা দেওয়া হয় খুনটা তখনও হয়নি।

যাঃ, তা হলে বেয়ারা জানল কী করে ?

বেয়ারার মতো পোশাক হলেই বেয়ারা হতে হবে তা তো নয়। ওরা যখন যায় তখনও সিংঘানিয়া পুরোপুরি মরেনি।

কিছু বলে গেছে ?

হ্যাঁ। বলে গেছে সে মারা গেলে ছবিগুলো যেন বম্বেতে মিস্টার কুমারকে দেওয়া হয়।

বড্ড খারাপ লাগছে এসব শুনতে।

আপনার অ্যালিবাই পোক্ত থাকলেই হল।

সেটা পোক্তই আছে। তোমরা মানবে কিনা দেখো।

মানব। প্রমাণ পেলে নিশ্চয়ই মানব। আপনি দারোয়ানটার সঙ্গে কথা বলুন।

কী বলতে হবে ?

সে আপনাকে চেনে কি না।

ধরো চেনে। তার পর ?

জিজ্ঞেস করবেন, সকালে বাড়ি থেকে কেউ বেরিয়েছে কি না।

তার পর ?

এইটুকুই আপাতত। ছাড়ছি।

দাঁড়াও। ইরা কী বলছে ?

কী বলবে ?

তার অ্যালিবাইও দেখছ তো।

অফ কোর্স।

ছবিগুলোর কী হবে শবর ?

কী করে বলি ? ছাড়ছি।

ইরাদেবী, আপনার রিভলভারটা কোথায় ?

কেন ?

দরকার আছে।

কেন দরকার বলুন।

জিনিসটা আছে তো।

আছে।

লাইসেন্সটা আমিই করিয়ে দিয়েছিলাম। মনে আছে ?

হ্যাঁ।

জিনিসটা আপনি কখনও ব্যবহার করেছেন ?

করেছি।

কী ভাবে ?

যখন লাইসেন্স করি তখন একজন অফিসার আমাকে বলেছিলেন রিভলভার কেনার পর যেন ফাঁকা জায়গায় গিয়ে কয়েকবার ফায়ার করি।

তাই করেছিলেন ?

হ্যাঁ।

আর কখনও ব্যবহা করেননি ?

ইরা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তেমন কিছু নয়।

ভেবে দেখুন। ব্যাপারটা ইমপট্যান্ট।

করেছি।

কী ভাবে ?

আমাদের বাড়িতে একবার চোর আসে।

কবে ?

পাঁচ ছয় মাস আগে।

তার পর ?

জানালার গ্রিল খুলে ঢুকবার চেষ্টা করে। তখন আমি গুলি চালাই।

বটে। তার গায়ে গুলি লেগেছিল ?

হ্যাঁ। তবে সিরিয়াস কিছু হয়নি। কারণ গুলি খেয়ে সে পালিয়ে যায়।

পুলিশে রিপোর্ট করেছিলেন ?

না।

সে কী ? রিপোর্ট করেননি কেন ?

কিছু চুরি যায়নি, লোকটাও মরেনি। রিপোর্ট করে কী হবে ?

লোকটা উন্ডেড হয়েছিল কি ?

বোধহয় হয়েছিল। জানালার নীচে রক্তের দাগ ছিল। রাস্তা অবধি রক্তের ফোঁটা দেখা গেছে। তারপর আর ছিল না।

রিপোর্ট করলে ভাল করতেন।

আমার ভয় হয়েছিল, পুলিশ জানলে আমার রিভলভারটা বাজেয়াপ্ত করবে।

তা করার কথা নয়। লোকে এসব অকেশনে সেলফ ডিফেন্সের জন্যই আগ্নেয়াস্ত্র রাখে। রিভলভারটা কোথায় থাকে ?

দিনের বেলা আলমারিতে চাবি দিয়ে রাখি। রাতে

বালিশের পাশে নিয়ে শুই।

কেন বলুন তো। ও পাড়ায় কি খুব চোর-ডাকাত ?

তা আছে। তা ছাড়া আমরা তো একতলায় থাকি। একতলাটা সব সময়েই একটু ইনসিকিওরড। দোতলা হচ্ছে। ওপর তলায় ততটা ভয় নেই।

আপনি রিভলভারের ইউজ তা হলে জানেন ?

জানি। না জানলে কি লাইসেন্স পাই ?

আজ সকালে কখন ঘুম থেকে উঠেছেন ?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন ?

দরকার আছে।

আমার ইনসোমনিয়া আছে। ঘুম হয় না।

একদমই হয় না ?

মাঝে মধ্যে একটু আধটু। কোনও ঠিক নেই।

আপনি কি ঘুমের ওষুধ খান ?

না। ভয় পাই।

কেন ?

আমার মা ঘুমের ওষুধের ওভারডোজে মারা যান।

তাঁরও কি ইনসোমনিয়া ছিল ?

না। অন্তত ক্রনিক নয়। একটু বেশি বয়সে হাইপারটেনশন থেকেই ঘুম ভাল হত না।

রাতে না ঘুমিয়ে কী করেন ?

লিখি, পড়ি। আগে বেহালা বাজাতাম। এখন বাজাই না।

কী লেখেন আর পড়েন ?

ডায়েরি লিখি। রোজনামচা। আর আবোল তাবোল যা খুশি। গল্পের বই পড়ি।

তা হলে তো আপনার ঘরে সারা রাতই আলো জ্বলে ?

যতক্ষণ লেখাপড়া করি ততক্ষণ জ্বলে। তারপর আলো নিবিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকি। সাধারণত রাত দুটো নাগাদ শুই।

কাল রাতের কথা বলুন।

কী বলব ?

কাল রাতে আপনি কটায় শুতে গিয়েছিলেন ?

কিন্তু এসব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

কারণ আছে। জরুরি কারণ।

কাল রাতে দেড়টা থেকে দুটোর মধ্যে শুয়ে পড়েছিলাম।

কটায় ঘুম থেকে উঠেছেন ?

ঘুমই নেই তো ঘুম থেকে ওঠা।

মানে বিছানা ছেড়েছেন কখন ?

খুব ভোরে। রোজই চারটে সাড়ে চারটের মধ্যে উঠে পড়ি।

তারপর কী করলেন ?

আজ ? আজও রোজকার মতো ভোরবেলা উঠে চান করলাম। তারপর চা খেলাম।

বেরোননি ?

না তো।

আপনি মর্নিং ওয়াক করেন না ?

না।

আপনার তো একটা গাড়ি আছে।

হ্যাঁ।

কে চালায় ?

ড্রাইভার।

আপনি চালান না ?

চালাই। মাঝে মাঝে।

আজ সকালে বাই চান্স বেরোননি তো গাড়ি নিয়ে ?

না।

ড্রাইভার কি চব্বিশ ঘণ্টার ?

হ্যাঁ। সে গ্যারেজের ওপরে মেজেনাইন ফ্লোরে থাকে।

ঠিক আছে।

কী হয়েছে বলুন তো।

মিস্টার সিংঘানিয়া খুন হয়েছেন।

ইরা একটু চুপ করে থেকে বলল, বেশ হয়েছে। নোংরা

লোক।

ছবিগুলো তো ওঁর আঁকা নয়।

তা হোক না। সব জেনেশুনেই তো এগজিবিশন করেছিল। সর্বজিৎ আরও নোংরা। কবে কখন হল?

আজ সকাল পাঁচটায়। ময়দানে।

ওঃ।

ওঁর ছবিগুলোও হোটেলের ঘর থেকে চুরি হয়ে গেছে।

খুব ভাল হয়েছে।

শবর একটু হাসল, তারপর বলল, আপনার মেয়েরা কি বাড়িতে আছে?

কেন থাকবে না?

তারা কোথায়?

দুজনেই অনেক বেলা অবধি ঘুমোয়। এই তো উঠল একটু আগে। এখন বোধহয় টয়লেটে। ডাকব নাকি?

না থাক।

টেলিফোন রেখে দিল শবর।

ইরা রাখল একটু দেরিতে। তার ভ্রূ কোঁচকাল। মুখে দুশ্চিন্তা। খবরটা একদিক দিয়ে ভাল। অন্য দিক দিয়ে ভাল কি?

টেলিফোনের সামনে কিছুক্ষণ ঝুম হয়ে বসে থেকে সে উঠে শোওয়ার ঘরে এল। এখনও তার বিছানাটা তোলা হয়নি। তার বাড়িতে তিন চারজন কাজের লোক। কিন্তু এ ঘরে কারও প্রবেশাধিকার সে দেয় না। তার কারণ তার শোওয়ার ঘরে নগদ কয়েক লক্ষ টাকা থাকে। ছবি বিক্রিরই টাকা। আগে সর্বজিৎ ছবি বিক্রি করত নগদ টাকায়। কোনও ব্যাংক রেকর্ড থাকত না। সেইসব টাকা ঘরেই জমে আছে। আজকাল সর্বজিৎ নিয়মটা পাল্টেছে। টাকা আজকাল ব্যাংকে জমা হয় এবং মোটা টাকা ইনকাম ট্যাক্স দিতে হয়। এই ব্যবস্থাটা ইরার একদম পছন্দ নয়। এই নিয়ে সর্বজিতের সঙ্গে তার একসময়ে তুমুল ঝগড়া হয়েছে। কিন্তু সর্বজিৎ বলেছে, আর নয়। যথেষ্ট রোজগার করেছি।

দিনের পর দিন এই ট্যাক্স ফাঁকি একদিন ধরা পড়বেই।

কিন্তু আগের টাকাটা আর ব্যাংকে ফেরত দেওয়া যায় না। যক্ষি বুড়ির মতো টাকাটা আগলে থাকে ইরা। টাকা ছাড়াও তার ইন্দিরা বিকাশ, কিষাণ বিকাশ এবং অনেক শেয়ার কেনা আছে। আছে বিস্তর সোনাদানাও। সে ঘরের বার হলে ঘর লক করে যায়। এ ঘরে বাড়ির আর কেউই বড় একটা ঢোকে না। তিনটে মজবুত স্টিলের আলমারি, একটা সেল্ফ, একটা খাট, একটা রাইটিং ডেস্ক আর ঘরের কোণে একটা টি ভি—মোটামুটি এই তার জিনিস। ওয়ার্ডরোব এবং ড্রেসিং টেবিল অবশ্য আছে।

ঘরে এসে বালিশের পাশ থেকে প্রথমেই রিভলভারটা সরাতে গেল ইরা।

আর তারপরই মাথায় বজ্রাঘাত। বত্রিশ বোরের লুগার রিভলভারটা নেই।

নেই তো নেই-ই। কোথাও নেই। ইরা পাগলের মতো সর্বত্র খুঁজে দেখল। কোথাও নেই।

এ ঘরে সে ছাড়া আর কেউ থাকে না। বাড়িটা বেশ বড়। টিনা, নিনা আর বিল্টুর আলাদা ঘর আছে। এ ঘরটাকে যতদূর সম্ভব জেলখানা বানিয়ে রেখেছে সে।

ইরা টাকা ভালবাসে। কেন ভালবাসে তার কোনও ব্যাখ্যা নেই। সুখের বিষয় টাকা তার অনেক আছে। সর্বজিৎ আজকাল টাকা-পয়সার ব্যাপারে খুব উদাসীন। রিখিয়াতে সে সাদামাটা ভাবে থাকে, শুনেছে ইরা। মদের খরচ আর যৎসামান্য হলেই তার চলে যায়। এজেন্টের মারফত টাকাটা সে পেয়ে যায়, কলকাতায় এসে ব্যাংক থেকে টাকা তোলে না। সুতরাং ব্যাংকে যা জমা হয় তার সবটার ওপরেই ইরার প্রভুত্ব। জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে ইচ্ছে করলেই সে টাকা তুলে নিতে পারে। সাবধানের মার নেই তাই ইরা ব্যাংকের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের টাকার সিংহভাগ সরিয়ে ফেলে তার নিজের আলাদা অ্যাকাউন্টে। এর ওপর কলেজের মাইনে যথেষ্টই পায় সে। না, টাকার দিক থেকে ইরা বেশ সুখে

আছে।

সুখের অভাব তার অন্য জায়গায়।

তার বয়স সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ। ছিপছিপে এবং সুগঠন শরীরে এখনও ভরা যৌবন। সর্বজিতের কাছ থেকে সে কোনওকালেই তেমন মনোযোগ পায়নি, পায়নি শরীরের ডাকে তেমন সাড়াও। তাদের বনিবনা হয়নি কখনও। বছরের পর বছর দুঃসহ এই অবনিবনা নিয়ে কেটেছে তাদের। বছরের মধ্যে হয়তো সাত আট মাসই কথা বন্ধ থাকত। মাঝে মধ্যে লাগত তুমুল ঝগড়া।

ইরা সেক্স নিয়ে অভিযোগ তুললে সর্বজিৎ বলত, সেক্সটা শতকরা আশি ভাগ মানসিক ব্যাপার, কুড়ি ভাগ শরীর। কোনও পুরুষ কোনও নারীর কাছে দিনের পর দিন অপমানিত হতে থাকলে তার প্রতি সেক্সুয়াল আর্জ থাকে না। তোমার প্রতিও আমার নেই।

তা হলে আমি কী করব?

সর্বজিৎ নির্বিকারভাবে বলেছে, অন্য পুরুষ খুঁজে নাও। তোমাকে বলেই দিচ্ছি, আমার দিক থেকে বাধা আসবে না। চাইলে ডিভোর্স করে বিয়েও করতে পারো। যা তোমার খুশি।

ডিভোর্সের কথা তাদের মধ্যে বারবার উঠলেও কে জানে কেন শেষ অবধি আইন আদালত করার আগ্রহ তারা কেউই দেখায়নি। সত্যি কথা বলতে কি, সর্বজিৎ বা ইরার কোনও দ্বিতীয় মহিলা বা পুরুষ থাকলে হয়তো আগ্রহটা হত। সেরকম ঘটনাও কিছু ছিল না। সুধাময় ঘোষ আর তাকে জড়িয়ে যে রটনাটা আছে সেটা যে একদম বাজে কথা সেটা অন্তত ইরা তো জানে। সুধাময় সর্বজিতের বন্ধু। খুব ভাল বন্ধু। কিন্তু ইরার সঙ্গে তার সেই সম্পর্ক নেই যার সুবাদে তাকে আর সুধাময়কে আদম আর ইভ বানানো যায়।

ইরার যৌবনকালটা মরুভূমির মতো। হাতে প্রচুর টাকা, বাড়ি, গাড়ি, সম্পন্নতার ছড়াছড়ি। তবু ওই একটা জায়গায় সে এক বিশুদ্ধ নারী।

খুবই উষর ছিল তার জীবন যতদিন না চোরটা এল।

না, শবরকে সে মোটেই মিথ্যে বলেনি। এক রাতে চোর এসেছিল ঠিকই। এবং সেদিন ইরা তার ক্রনিক ইনসোমনিয়ার মধ্যেও বিরল যে দু এক রাত ঘুমোয় সেইরকমই ঘুমিয়ে পড়েছিল। এবং ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে জানালার বাইরে লোকটাকে দেখে সে গুলিও করেছিল ঠিকই। এবং আহত চোর পড়ে গিয়েছিল জানালার নীচে।

বাকিটুকু শবরকে বানিয়ে বলেছে ইরা। চোরটা পালায়নি। সে জখম হাত নিয়ে পড়ে গেলেও কয়েক সেকেন্ড পর উঠে দাঁড়ায়। ইরা ততক্ষণে ঘরের বড় লাইট জ্বেলেছে এবং লোকজন ডাকবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

চোরটা বলল, প্লিজ। আমার কথা শুনুন।

ইরা ফিরে জানালার দিকে চেয়ে হতবাক। ঘরের স্টিক লাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে চোরকে। খুবই চেনা চোর।

ইরা অবাক হয়ে বলে, তুমি। এত রাতে তুমি এখানে কেন? আর এভাবে কেন?

প্লিজ! আমার কিছু কথা আছে।

কথা। মাঝরাতে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছ? তাও জানালার গ্রিল ভেঙে? আমি তোমাকে পুলিশে দেব।

দেখুন, আমি তো পালাইনি। পুলিশে খবর দিন, আমি কিন্তু পালাব না।

তা হলে এরকম করলে কেন? তুমি কি পাগল?

তাই হবে। প্লিজ লেট মি ইন।

না। এত রাতে তোমাকে ঘরে ঢুকতে দিতে পারি না। আমার মনে হচ্ছে তোমার মাথার ঠিক নেই। আমি তোমাকে পুলিশেও দিতে চাই না। বাড়ি যাও ডেভিড।

আমি ফিরে যাওয়ার জন্য আসিনি। আমি এসেছি আপনার কাছে।

তুমি বোধহয় ড্রাগ অ্যাডিক্ট। নাকি মদ খেয়েছ?

ওসব নয়। আপনি মিথ্যে সন্দেহ করছেন। আই অ্যাম

ব্লিডিং লাইক হেল। দেখছেন তো। তবু দাঁড়িয়ে আছি কেন ? আমার দরকারটা জরুরি।

তোমার মতলব ভাল নয়।

ভয় পাবেন না। আমি শত অপরাধ করলেও আপনার কোনও ক্ষতি কখনও করব না। সে সাধ্যই আমার নেই।

আচ্ছা, একটা কথা বলো। তুমি কি টিনাকে সিডিউস করতে এসেছিলে ? ঘর ভুল করে আমার ঘরে হানা দিয়েছ ?

না ম্যাডাম, টিনার ঘর আমি চিনি। আমি আপনার কাছেই এসেছি।

ডেভিডের বয়স আঠাশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। রোগা, লম্বা এবং দাড়ি গোঁফে সমাচ্ছন্ন এক ভাবুক চেহারা। মাথায় অবিন্যস্ত চুলের ঝাঁপি। তার চোখ দুটো অস্বাভাবিক টানা এবং মাদকতাময়। কিশোরী টিনা তার অনেক বন্ধুদের মধ্যে এই বয়স্ক বন্ধুটিকে একটু বেশিই পছন্দ করে। শোনা যায়, ডেভিড বাউন্ডুলে, কিন্তু কেরলে তার বাড়ির অবস্থা খুবই ভাল। তার বাবা একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট।

একটু দোনোমোনো করছিল ইরা। তবে সে সাহসী মেয়ে। বলল, তোমাকে ঢুকতে দিতে পারি। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো। আমার হাতে রিভলভার থাকবে। কোনওরকম বেচাল দেখলেই কিন্তু গুলি করব।

অ্যাগ্রিড ম্যাডাম।

এ ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার পথ একটু ঘোরানো। প্যাসেজে গিয়ে তবে সদরে যেতে হবে। কিন্তু বাথরুমে একটা জমাদার আসার সরু দরজা আছে। সেইটে খুলে দিল ইরা।

ডেভিড ঘরে এল।

রক্তাক্ত বাঁ হাতটা ডান হাতে চেপে ধরে রেখেছিল ডেভিড।

ইরার একটু মায়া হল। সে ড্রয়ার খুলে ব্যান্ড এইড আর তুলো বের করে বলল, লাগিয়ে নাও।

ডেভিড মাথা নেড়ে বলল, লাগবে না। দি উন্ড ইজ নট

ভেরি সিরিয়াস।

তুমি তো মারা যেতে পারতে ডেভিড।

আপনার রিভলভার আছে জানলে সাবধান হতাম।

এভাবে কেউ আসে ? কী এমন কথা যা মাঝরাতে বলতে হবে ?

হাসলে ডেভিডকে যে কী সুন্দর দেখায় তা লক্ষ করে অবাক হল ইরা। ডেভিড কালো, কিন্তু দারুণ হ্যান্ডসাম। বলল, আমি আপনাকে একটু চমকে দিতেই চেয়েছিলাম।

কেন ডেভিড ?

আমি যা বলতে এসেছি তা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ঠাণ্ডা মাথায় বলা যায় না। ইট রিকোয়ারস সাম ম্যাডনেস।

বল কী ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

রিভলভার তো আপনার হাতেই আছে। চাইলে গুলি করে দেবেন। কিন্তু আমাকে কথাটা বলতেই হবে।

বলে ফেলো ডেভিড।

আমি আপনাকে ভীষণ ভালবাসি।

এত অবাক ইরা কখনও হয়নি। দু বছর আগে তার বয়স ছিল আর একটু কম। তবু হিসেব মতো ডেভিড তার চেয়ে ছয় সাত বছরের ছোটো, টিনার বন্ধু। এরকমও হয় নাকি ?

রেগে যাবেন না। এসব ব্যাপারে কিছু করার থাকে না। লাভ কামস লাইক এ ফ্লাড।

পাগল হয়েছ ?

ডেভিড মাথা নেড়ে বলল, সর্ট অফ ম্যাডনেস, ইয়েস। কিন্তু আমি আপনার জন্য এত আকর্ষণ বোধ করি, এত আপনার কথা ভাবি যে আমার কিছু করার থাকে না।

তুমি টিনার বন্ধু, মনে রেখো।

ডেভিড তেমনি সুন্দর হেসে বলল, কখনও ওর বয় ফ্রেন্ড ছিলাম না। আমি ওর কাছে কৃতজ্ঞ। ওর বন্ধুত্বের সূত্রেই তো আপনাকে দেখলাম।

ইরা মুখে প্রতিবাদ করলেও ভিতরে ভিতরে কি খুশি হয়নি ? মধ্য তিরিশে সে এখনও যুবকদের মুগ্ধ করতে

পারে ?

ইরা রিভলভারটা ড্রয়ারে রেখে খুব যত্ন করে ডেভিডের হাতে অ্যান্টিসেপটিক লাগাল। ক্ষতস্থান সিল করে দিল। তারপর বলল, অনেক পাগলামি হয়েছে। এবার বাড়ি যাও।

আমি শুনেছিলাম, আপনার ইনসোমনিয়া আছে।

আছেই তো।

আমাকে একটা অনুমতি দেবেন ?

কীসের অনুমতি ?

আমি রাত বারোটা একটায় চলে আসব। তারপর আপনার সঙ্গে গল্প করব বা বসে থাকব। যদি আপনি পছন্দ না করেন তা হলে অন্য কথা।

সেটা হয় না।

কেন হয় না ? আপনি ইচ্ছে করলেই হয়।

রাতে একজন পুরুষকে ... না, না। ছিঃ !

আপনি তো সংস্কার থেকে বলছেন। কিন্তু ভালবাসা কি ওসব মানে ?

আমি তো আর তোমার প্রেমে পড়িনি ডেভিড।

ঠিক কথা। কিন্তু আপনি একজন একা নিদ্রাহীন সঙ্গীহীন মানুষ। আমি আপনাকে সঙ্গ দিতে আসব। এইমাত্র।

আমার ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। তারা টের পাবে।

না। আমরা সতর্ক হলে কেউ টের পাবে না।

কেন পাগলামি করছ ডেভিড ?

পাগল তো পাগলামিই করবে, না কি ?

তুমি বাড়ি যাও।

দেখুন ইরাদেবী, আমি ভাল ঘরের ছেলে। আমার বাবা বিগ ম্যান। আমি একজন কোয়ালিফায়েড ডাক্তার, যদিও কখনও প্র্যাকটিস করিনি। আমি নেশা করি না। বাউণ্ডুলে, ইয়েস। আমার ভেসে বেড়াতে ভাল লাগে। আপনার আগে আমি কোনও মহিলার প্রেমে পড়িনি। আই অ্যাম নট এ উওম্যানাইজার। দয়া করে আমাকে লম্পট ভাববেন না।

ঠিক আছে। কিন্তু তুমি যা চাইছ তাও হয় না।

আমি আজ যাচ্ছি। আপনি ভাবুন।

কী ভাবব ?

জাস্ট থিংক ইট ওভার।

তুমি আমাকে চাইছ তো ? সেটা হয় না।

ওভাবে চাইছি না। জাস্ট কম্পানি। অনেক সময় বিশুদ্ধ প্রেম শরীর-নির্ভর হয় না। মেয়েদের শরীর নিয়ে সংস্কার থাকে। আমি সেটা চাই না। আমি শুধু আসব, বসে থাকব, চলে যাব।

শুধু এইটুকু ?

শুধু এইটুকু।

আজ যাও। আমাকে খুব নার্ভাস করে দিয়েছ।

কথাটা ভেবে দেখবেন ?

দেখব।

কথা দিচ্ছেন ?

হ্যাঁ।

তা হলে আমি কাল আসব। আফটার মিডনাইট।

ঠিক আছে।

ইরাকে জানালার বাইরে একটা আড়াল দাঁড় করানোর জন্য একটা দেয়াল তুলতে হল। তাতে আলাদা দরজা ইত্যাদি। জানালায় লাগাতে হল ভারী পর্দা। হ্যাঁ, সে ডেভিডকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। যা ডেভিড চেয়েছিল তার চেয়ে আরও একটু বেশিই।

এই একটা ঘটনার কথা কেউ জানে না। জানলেও কেউ তাকে কিছু বলেনি।

গত দুবছর ধরে প্রায় টানা মধ্যরাতে ডেভিড এসেছে। বসেই থেকেছে বেশিরভাগ। ঘরের ড্রিম লাইট জ্বালিয়ে তারা গল্প করেছে। কখনও সখনও শরীরের মিলনও। কিন্তু ব্যাপারটা ইরার কখনও ভাল লাগেনি। শরীরের মিলনে বরাবর তার ভিতরে একটা প্রতিরোধ যেন মাথা তুলত। আর আশ্চর্যের বিষয়, এই সুপুরুষ ও শক্তিমান যুবকটির প্রেমে সে আজও পড়েনি। ভাল লাগে না, তা নয়। কিন্তু তার মধ্যে

আবেগ কাজ করে না কখনও। উথাল পাথাল হয় না বুক।

কাল রাতেও ডেভিড এসেছিল। কিছুটা উদ্‌ভ্রান্ত ছিল সে।

তোমাকে ওরকম দেখাচ্ছে কেন ?

আমি একটু রেস্টলেস।

কেন ডেভিড ?

আই কানট হেলপ ইউ। আপনি ওই স্ক্যান্ডালটার জন্য কষ্ট পাচ্ছেন।

তা তো পাচ্ছিই। কে যে এ কাজ করতে পারে।

আপনার হাজব্যান্ড নয় বলছেন ?

সর্বজিৎ সব পারে। তবে ওর পক্ষে তোমার বা বাণ্টুর ছবি আঁকা তো সম্ভব নয়।

তা হলে কে হতে পারে বলে আন্দাজ করেন ?

বুঝতে পারছি না।

একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

নিশ্চয়ই।

আপনি একজন পেইন্টারকে বিয়ে করলেন কেন ?

বাঃ রে, তাতে দোষ কী ?

দোষের কথা নয়। আপনি একজন পেইন্টারকেই কেন পছন্দ করলেন ?

এমনি।

আপনি নিজে আঁকতেন ?

কেন বল তো ?

আপনার কথাবার্তায় মনে হয়, আপনি ছবি সম্পর্কে জানেন।

তা জানি। জানব না কেন ? পেইন্টারের ঘর করেছি যে!

নিজে কখনও আঁকেননি ?

একটু আধটু চেষ্টা কি আর করিনি ? তবে হয়নি।

আপনার কাছে তো কাগজ কলম আছে। আমার একটা স্কেচ করবেন ?

দূর ! ওসব পারি না ।

জাস্ট ট্রাই । দেখাই যাক না ।

ইরা কাগজ কলম নিয়ে বসল । একটা স্কেচ করেও ফেলল সে ।

দেখে ডেভিড বলল, মাই গড ।

কী হল ?

আপনার হাত তো খুব সেট ।

যাঃ, পাগল !

আচ্ছা, আমি এটা রেখে দিচ্ছি ।

রাখো । তবে ওটা কিছু হয়নি ।

ডেভিড রাত তিনটের সময়ে গেছে । তারপর শুয়েছে ইরা । তার ঘুম আসেনি ।

আর এখন রিভলভারটা পাচ্ছে না সে ।

বিবশ হয়ে সে কিছুক্ষণ বিছানায় বসে রইল । তার খুব স্পষ্ট মনে আছে রিভলভার রোজকার মতোই বালিশের পাশে পাতা একটা ছোটো প্লাস্টিক শিটের ওপর রাখা ছিল । বিছানায় পাছে রিভলভারের তেল-টেল লাগে তাই ওই প্লাস্টিকের ব্যবস্থা । সেটা আছে, কিন্তু জিনিসটা নেই ।

মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছিল তার ।

॥ চার ॥

অফিসে বসে ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিপোর্টটা গম্ভীর মুখে দেখছিল শবর। ভ্রূ কোঁচকানো অ্যাসিস্ট্যান্ট লালু পাশে দাঁড়ানো।

আর ইউ সিওর লালু ?

অ্যাবসোলিউটলি।

ক্রস চেক করেছ ?

হ্যাঁ স্যার।

শবর পিছনে হেলান দিয়ে বসে বলল, দেন দি কমপ্লিকেশন ডীপেনস।

হ্যাঁ স্যার।

শোনো, মিস্টার সরকারকে আমাদের ফাইন্ডিংসটা এখনই জানানোর দরকার নেই।

ঠিক আছে স্যার।

আমি আজই একবার দেওঘর যাচ্ছি। কাল ফিরব। ট্রেনের একটা টিকিট অ্যারেঞ্জ করো। যে কোনও ট্রেন।

নো প্রবলেম স্যার।

লালু চলে যাওয়ার পর শবর অনেকক্ষণ সিলিং-এর দিকে চেয়ে রইল। তারপর উঠল। দেওঘর।

ভোরবেলা জশিডিতে নেমে একটা অটো রিক্সা ধরে সোজা রিখিয়ায় হাজির হয়ে গেল শবর।

তোমার নাম বাণ্টা ?

জি হুজুর।

কতদিন এখানে কাজ করছ ?

চার পাঁচ বরিষ হবে।

বাণ্টা, তোমার কাছে কয়েকটা জিনিস জানতে চাই।

বলুন।

এই ফটোটা দেখো, চিনতে পারো ?

জি।

এ লোকটা কে ?

নাম তো মালুম নেই।

কতদিন হল আসছে এখানে ?

করিব দো তিন সাল হবে।

এসে কী করে ?

কুছ মালুম নেহি বাবু। আসে, চলে যায়।

কতদিন থাকে ?

রহতা নেহি। আকে চলা যাতা। দো তিন চার ঘণ্টা রহতা হ্যায়।

ওদের কী কথা হয় জানো ?

নেহি হুজুর।

কখনও কিছু কানে আসেনি।

মালুম হোতা বাবুসে পয়সা লেতা হ্যায়।

দেখেছ কখনও ?

নেহি হুজুর। ব্যাঙ্ক কা যো কাগজ হ্যায় না, চেক ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, চেক।

ওহি লেতা হ্যায়।

কত টাকার চেক জানো ?

নেহি হুজুর। এক দো দফে দেখা।

লোকটা ঘন ঘন আসে ?

দো তিন মাহিনা বাদ বাদ।

আমি যে পুলিশের লোক তা তুমি জানো ?

নেহি হুজুর।

আমি বাড়িটা একটু সার্চ করতে চাই।

বাণ্টা মাথা নেড়ে বলে, হুকুম নেহি হুজুর।

শবর মায়া ভরা চোখে বাণ্টার দিকে একটু তাকাল। বাণ্টা বেশ বলবান, লম্বা চওড়া মানুষ। আড়ে দীঘে শবরের ডবল।

শবর ঘড়ি দেখল। তাকে আজকের তুফান বা ডিলাক্স এক্সপ্রেস ধরে ফিরে যেতে হবে। থানায় গিয়ে সার্চ ওয়ারেন্ট

বা সেপাই আনার সময় নেই। অগত্যা—

শবর এক পা বাণ্টার দিকে এগোল। তার ডান হাতটা বিদ্যুদ্বেগে একটা চপারের মতো নেমে এল বাণ্টার মাথায়। একটা শব্দও না করে বাণ্টা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। সংজ্ঞাহীন।

বিশাল বাড়ির পিছন দিকটায় একটা বড় ঘর হল সর্বজিতের স্টুডিও। একটু অগোছালো। একদিকে ডাঁই করা নতুন ক্যানভাস। অনেক সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ছবি চারদিকে ছড়ানো। একধারে একটা টেবিল। তার ড্রয়ারগুলো খুঁজে দেখল শবর। অজস্র স্কেচ আঁকা কাগজ পাওয়া গেল। বেশিরভাগই মানুষের মুখ।

একদম তলার ড্রয়ারে একটা ম্যানিলা এনভেলপের মধ্যে একটা স্কেচ পাওয়া গেল অজস্র কাগজের মধ্যে। সেটা পকেটস্থ করল সে। তারপর সন্তর্পণে বেরিয়ে এল।

বাইরে তার ভাড়া-করা অটো রিক্সা অপেক্ষা করছিল। সে উঠে পড়ল।

আপনি ডেভিড ?

হ্যাঁ।

আপনার বাবার নাম জন ডালি ?

হ্যাঁ।

উনি কী করেন ?

একজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট।

কীসের ইন্ডাস্ট্রি ?

মেশিন পার্টস।

বিগ ম্যান ?

হ্যাঁ।

আপনি কতদিন কলকাতায় আছেন ?

পাঁচ ছ বছর।

এখানে কী করেন ?

ফ্রি লান্স জার্নালিস্ট।

মাসে কত রোজগার হয় ?

কিছু ঠিক নেই। দু তিন হাজার হবে।

এই ফ্ল্যাটটার ভাড়া কত ?

দু হাজার।

কী ভাবে এত টাকা ভাড়া দেন ?

দিই।

বাট হাউ ?

ম্যানেজ করি।

টিনার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী ?

উই আর ফ্রেন্ডস।

ইন্টিমেট ?

সর্ট অফ।

আর ইউ ইন লাভ ?

মে বি।

ডেভিড, প্রেমে পড়া অপরাধ নয়। বলুন।

সত্যি কথা বলতে কি, আমরা বন্ধু। তার বেশি কিছু নয়।

ডেভিড, আপনি টিনার বাবাকে চেনেন ?

না। নেভার মেট হিম।

নেভার ?

হ্যাঁ।

কথাটা বিশ্বাস করতে বলেন ?

নয় কেন ?

কথাটা সত্যি নয় বলে।

ডেভিড চুপ করে থাকে।

আপনি কত দিনের ড্রাগ অ্যাডিক্ট ?

ড্রাগ। আই নেভার—

আই নো এ ড্রাগ অ্যাডিক্ট হোয়েন আই সি ওয়ান।

ডেভিড কাঁধ ঝাঁকাল। কিছু বলল না।

কতদিনের নেশা ?

চার পাঁচ বছর হবে।

ব্রাউন সুগার ?

আই ওয়াজ অন হ্যাশ। রিসেন্টলি ব্রাউন সুগার। ইয়েস।

টাকা কে দেয় ? সর্বজিৎ সরকার ?

হি হ্যাজ মানি।

সেটা কথা নয়। টাকাটা উনি এমনি দেন না।

আমি কিছু সার্ভিস দিই।

সেটা জানি। হাউ ডিড ইউ মেক এ কন্ট্যাক্ট উইথ হিম ?

টিনার কাছে শুনেছিলাম ওর বাবা ফ্রাস্টেটেড অ্যান্ড আনহ্যাপি। রিখিয়ায় থাকেন।

একদিন ওখানে গিয়ে হাজির হলেন ?

হ্যাঁ।

তারপর ?

আমাদের অনেক কথা হল।

কী কথা ?

অ্যাবাউট হিজ ফ্যামিলি। হিজ ওয়াইফ অ্যান্ড চিল্ডরেন।

কী কথা ?

সব ডিটেলসে মনে নেই। তবে—

তবে—

উনি ওঁর ওয়াইফকে খুব ঘৃণা করেন।

তাতে কী ?

উনি আমাকে একটা কাজ দিয়েছিলেন। টু সিডিউস হিজ ওয়াইফ।

কিন্তু কেন ?

টু টেস্ট হার চেস্টিটি পারহ্যাপস।

আপনি তাই করলেন ?

হ্যাঁ, ইট ওয়াজ এ বিট ড্রামাটিক।

ওয়াজ ইট ইজি ?

মোর অর লেস। মেয়েরা মধ্যবয়সে একটু অ্যাডভেঞ্চারাস হয়ে যায়। বিশেষ করে যারা সেক্স স্টার্ভড।

সত্যি কথা বলছেন ?

আই হ্যাভ নাথিং টু লুজ।

ছবিগুলো উনি কবে আঁকতে শুরু করেন ?

তা জানি না।

এই স্কেচটা দেখুন। এটা কার মুখ ?

বান্টু সিং-এর।

বান্টুর ছবি তো উনি কল্পনা থেকে আঁকেননি ?

না। আই সাপ্লায়েড দা ফটোগ্রাফ।

আপনিই ওর ইনফর্মার তা হলে ?

ইট ওয়াজ এ জব টু মি। জাস্ট এ জব।

এখন বলুন, ইরাদেবীর সঙ্গে আপনার কতটা ঘনিষ্ঠতা

অনেকটাই।

তিনি কি আপনার প্রেমে পড়েছেন ?

ঠিক তা বলা যায় না।

আপনি ?

আই লাইক হার।

সেক্স ?

ইয়েস। অকেশনালি। শি হ্যাজ প্রেজুডিস।

মা মেয়ে দুজনের সঙ্গেই ?

না। টিনাকে আমি টাচ করিনি।

কেন, আপনার কি সংস্কার আছে ?

তা নয়। তবে সর্বজিৎ সরকার ওটা সহ্য করতেন না।

ছবিগুলো আপনি দেখেছেন ?

হ্যাঁ।

একটা পরিবারকে ওরকম এক্সপোজ করা কি ঠিক ?

ডেভিড ফের কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, স্যার, আমি কারও মর‍্যাল গার্জিয়ান নই। আমার টাকার দরকার। আমি কাজ করেছি।

আপনার বাবা জন ডালি আসলে কী করেন ?

বললাম তো—

ওটা মিথ্যে কথা।

বাবা প্রফেসর। নাউ রিটায়ার্ড।

আপনি ডাক্তার ?

পাশ করিনি। তবে ফোর্থ ইয়ার অবধি পড়েছি।

সর্বজিৎ সরকার কত টাকা এ পর্যন্ত দিয়েছেন আপনাকে ?

হিসেব নেই। থার্টি ফর্টি থাউজ্যান্ড হবে।

হাউ দা পেমেন্ট ওয়াজ মেড ?

উনি চেক দিতেন, আমি কলকাতায় এসে ভাঙিয়ে নিতাম।

এবার একটা গুরুতর প্রশ্ন।

জানি। ইউ আর হোমিং ইন।

মার্ডারের দিন সকালে কোথায় ছিলেন ?

নট অন দি স্পট।

দেন ইউ আর স্টেটিং দ্যাট ইউ আর নট গিল্টি ?

ইফ ইট স্যুটস ইউ স্যার।

কখনও রিভলভার ব্যবহার করেছেন ?

না। চোখেই দেখিনি।

ঠিক তো ?

ডেভিড হাসল। কিছু বলল না।

ছবিগুলো হোটেল রুম থেকে কীভাবে চুরি যায় ?

আপনি তো জানেন।

তবু শুনি।

আমি একজন বেয়ারাকে কিছু বখশিস দিয়ে বলি সিংঘানিয়া ময়দানে বিপদে পড়েছেন। খবরটা যেন ওর লোকদের দেওয়া হয়।

তারপর ?

ওরা তড়িঘড়ি বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি হোটেলে ঢুকি।

ঢুকতে দিল ?

কেন দেবে না ? আমি দুদিন ওই হোটেলে ছিলাম যে।

মাই গড। তারপর ?

ছবিগুলো আমার ঘরে ট্রান্সফার করে দিই।

তারপর ?

পরদিন সর্বজিৎ সরকার এসে প্যাক করে নিয়ে যান।

ছবিগুলো এখন কোথায় ?

জানি না। উনি বলেননি। অ্যাম আই আন্ডার অ্যারেস্ট ?

এখনও নয়। কিন্তু আর একটা কথা।

বলুন।

রিগার্ডিং দা মার্ডার উইপন।

ইজি। আই স্টোল হার রিভলভার দ্যাট মর্নিং।

আবার জায়গামতো রিপ্লেস করেছেন কি ?

ডেভিড মাথা নাড়ল, না। ওটা আর দেখিনি।

বলতে চান ওটা সর্বজিতের কাছেই আছে ?

থাকতে পারে।

এই অপারেশনটার জন্য কত টাকা পেলেন ?

টেন থাউজ্যান্ড অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচারস।

শুনুন ডেভিড, খুন করার মতো এলিমেন্ট সর্বজিতের মধ্যে নেই। হু ডিড ইট ?

আমি জানি না স্যার। আই অ্যাম জাস্ট এ স্টুল।

ইউ আর অ্যাকসেসরি টু এ মার্ডার।

ডেভিড কাঁধ ঝাঁকাল, আই অ্যাম ইন মাই লাস্ট স্টেজ অফ অ্যাডিকশন। আই শ্যাল নট লিভ ভেরি লং। গো অ্যাহেড অ্যান্ড হ্যাং মি।

॥ পাঁচ ॥

ডোরবেল শুনে দুপুরে যখন দরজা খুলল কাজের লোক মাধবী তখন সে যাকে দেখল তাকে চিনতে পারল না।

কাকে চাই ?

ইরা নেই ?

ওঃ, বউদি ! না, উনি মার্কেটিং-এ গেছেন।

ও।

আপনি কে ?

আমার নাম বরুণ দাস। আমি ইরার জ্যাঠতুতো দাদা।

ও। বসুন তা হলে। বউদি এসে যাবেন।

অনেক দূর থেকে আসছি। একটু কফি খাওয়াবে ?

হ্যাঁ, বসুন।

দাড়ি গোঁফ ও কালো চশমা পরা লোকটা বসল। মাধবী রান্নাঘরের দিকে চলে যাওয়া মাত্র লোকটা বেড়ালের মতো উঠে পড়ল। দ্রুত পায়ে ইরার ঘরের সামনে হাজির হয়ে একটা চাবি বের করে দরজাটা খুলে ফেলল। মাত্র দশ সেকেন্ডের মধ্যেই বেরিয়ে এল সে। দরজার অটোমেটিক লক বন্ধ হয়ে গেল।

লোকটা লম্বা পায়ে বেরিয়ে অপেক্ষমাণ একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল।

একটু বাদে চা নিয়ে এসে মাধবী দেখল, লোকটা হাওয়া।

ইরা ফিরল আরও ঘণ্টাখানেক বাদে।

ও বউদি, চোর ছ্যাঁচোড় কিনা জানি না। একটা লোক এসেছিল। তোমার নাকি দাদা হয়। বরুণ দাস, চেনো ?

ইরা ভ্রূ কুঁচকে বলল, বরুণ দাস ! যাঃ, জন্মে ও নাম শুনিনি। কীরকম চেহারা ?

বেশ লম্বা, দাড়ি গোঁফ আছে, কালো চশমা।

ইরা শঙ্কিত হয়ে বলল, কী চাইছিল ?

কফি খেতে চাইল। কফি এনে দেখি লোকটা নেই।

সর্বনাশ ! কিছু নিয়ে যায়নি তো !

না। সন্দেহ হওয়ায় সব ভাল করে দেখেছি। কিছু নিয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

ফট করে কেন যে লোকের কথা বিশ্বাস করিস। যাকে চিনিস না, তাকে কখনও বসতে দিবি না আমি না থাকলে।

ইরা নিজের ঘরের দরজা খুলল। কাপড় ছাড়তে ছাড়তেই হঠাৎ চোখটা গিয়ে পড়ল বিছানায়। বালিশের পাশে প্লাস্টিক শিটের ওপর রিভলভারটা শান্তভাবে শুয়ে আছে।

ইরা হিম হয়ে গেল। কে এসেছিল ঘরে ? কীভাবে এল ?

শবর এল আরও দু ঘণ্টা বাদে।

আপনার রিভলভারটা কোথায় ?

আমার কাছেই আছে।

লেট মি সি ইট।

কেন বলুন তো !

ইরা দেবী, আপনার রিভলভারটা সিংঘানিয়াকে খুন করার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। সুতরাং বাধা দেবেন না।

ঠিক আছে, দিচ্ছি। কিন্তু ওটা বাজেয়াপ্ত করবেন না।

আমার পক্ষে কথা দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু রিভলভারটা যে কিছুক্ষণের জন্য আপনার কাছে ছিল না সেটা আপনি আমাকে জানাতে পারতেন।

ইরা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে বলল, ভয়ে জানাইনি।

শুনুন, ওটা হাত দিয়ে ধরবেন না। একটা রুমাল বা ঝাড়ন দিয়ে ধরে নিয়ে আসুন। যদিও জানি, ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাওয়া যাবে না।

ইরা নিয়ে এল রুমালে করেই।

শবর সেটা একটা প্লাস্টিকের ক্যারি ব্যাগে ভরে বলল, কখন কে এটা দিয়ে গেল ?

আমার কাজের লোক বলছে বরুণ দাস নামে কে একজন এসে আমার দাদা বলে পরিচয় দিয়ে কফি খেতে চায়।

কীরকম চেহারা ?

লম্বা। দাড়ি গোঁফ আর কালো চশমা ছিল।

বাঃ, একেবারে রহস্য উপন্যাস। সে রিভলভারটা কীভাবে রেখে যায় ?

আমার ঘরে।

ঘরে ? ঘর তো তালা দেওয়া থাকে শুনেছি।

হ্যাঁ। বুঝতে পারছি না। সে ঘরে ঢুকেছিল নিশ্চয়ই।

একটা কথা।

বলুন।

রিগার্ডিং ডেভিড। আপনার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক ?

কী আবার। কিছু নয়।

লুকিয়ে লাভ নেই।

সুন্দরী ইরা হঠাৎ টকটকে লাল হয়ে গেল লজ্জায়। মাথা নিচু করে বলল, ডেভিড ওয়াজ পারসিসেন্ট।

অ্যান্ড ইউ জাস্ট সারেন্ডারড ?

হ্যাঁ।

আপনি কি জানেন ও ড্রাগ অ্যাডিক্ট ?

প্রথম প্রথম সন্দেহ হয়েছিল।

রিভলভারটা চুরি যাওয়ার পর পুলিশকে জানাননি কেন ?

ভয় পেয়েছিলাম।

কীসের ভয় ?

জানি না।

জানেন। রিভলভারটা যে ডেভিড চুরি করেছিল এটা বুঝতে পেরেই রিপোর্ট করেননি। পাছে পুলিশ ডেভিডকে ধরে এবং স্ক্যান্ডালটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ঠিক কি না !

হ্যাঁ।

ঠিক আছে। আপনি ডেভিডকে কতখানি ভালবাসেন ?

এটা ঠিক ওরকম ব্যাপার নয়। ডেভিড জোর করেই রিলেশানটা তৈরি করেছে।

আর আপনি প্রশ্রয় দিয়েছেন ?

আমি রাতে ঘুমোতে পারি না, আপনাকে বলেছি তো। ডেভিড ওই সময়ে আমাকে সঙ্গ দিত।

রোজ ?

প্রায়ই। সপ্তাহে চার পাঁচ দিন।

ডেভিডকে সন্দেহ হত না ?

সন্দেহ ! কীসের সন্দেহ ?

ওর কোনও আলটেরিয়র মোটিভ আছে কি না।

ওর কোনও মোটিভ বুঝতাম না। ও পাগলের মতো আমাকে ভালবাসত।

চমৎকার।

ডেভিড কি কিছু করেছে ? প্লিজ, বলুন।

জানি না। ইনভেস্টিগেশন চলছে। দেখা যাক।

॥ ছয় ॥

দরজা খুলে সর্বজিৎ দেখল, ডেভিড।

কী চাও ডেভিড ?

ডেভিড হাসল, জাস্ট টু সি ইউ।

এখানে এসে ভুল করেছ। কখনও এসো না। চলে যাও।

মিস্টার সরকার, আমি বাঁচতে চাই।

তার মানে ?

আমি ড্রাগ ছাড়তে চাই। একটা ক্লিনিকে ভর্তি হবো। আই নিড মানি।

তোমার তো টাকার অভাব হওয়ার কথা নয় ডেভিড। যথেষ্ট দিয়েছি।

ঠিক কথা। আর হয়তো বিজনেস টার্ম-এ আসব না আপনার সঙ্গে। প্লিজ, হেলপ মি।

কত চাও ?

পঞ্চাশ হাজার।

মাই গড। এ তো অনেক টাকা।

না মিস্টার সরকার, এটা অনেক টাকা নয়। ক্লিনিকের খরচ অনেক। একজন মৃতপ্রায় মানুষকে বাঁচতে সাহায্য করুন।

তুমি ভাবিয়ে তুললে। তোমার চাহিদার শেষ নেই।

আর আসব না। কথা দিচ্ছি।

ড্রাগ অ্যাডিক্টদের কথার দামও থাকে না।

এবার দেখুন। শেষ বার।

আমি জানি টাকাটা তুমি ড্রাগের পিছনেই ওড়াবে। তারপর আবার চাইতে আসবে। তুমি কি ব্ল্যাকমেল করছ আমাকে ?

না। ব্ল্যাকমেল কেন হবে ?

ডেভিড, আমার মন ভাল নেই। সিংঘানিয়া খুন হওয়ায় আমার ঝামেলা বেড়েছে। পুলিশ আমাকে সন্দেহ করছে। কে যে কাণ্ডটা করল কে জানে।

কোনও মাগার হবে।

মাগার হলে তো হতই। কিন্তু সব এমন কাকতালীয় ভাবে হবে কেন বুঝতে পারছি না। যাই হোক, আমার মাথা এখন খুব গরম। লিভ মি অ্যালোন।

জাস্ট একটা চেকে একটা সই। তার বেশি তো কিছু না।

ওঃ ডেভিড।

প্লিজ স্যার।

ঠিক আছে, তুমি ক্লিনিকের ঠিকানা দাও, আই উইল মেক দি পেমেন্ট দেয়ার।

কেন, আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না ?

না ডেভিড, তোমাকে বিশ্বাস করার কারণ নেই।

এতদিন তো বিশ্বাস করেছিলেন।

না, করিনি। ইউ ডিড এ জব ফর মি। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্যাট।

ডেভিড একটু হাসল। সেই সুন্দর হাসি। তারপর জামার তলা থেকে একটা চপার বের করে বলল, রাইট দি চেক ইউ বাস্টার্ড।

ওটা কী হচ্ছে ডেভিড ?

ইটস এ শো-ডাউন। রাইট ইট।

সর্বজিৎ এক পা পিছিয়ে গেল। তারপর বলল, ডেভিড, আমার সন্দেহ হয়, সিংঘানিয়াকে মেরেছ তুমিই। কেন মেরেছ ? হীরের আংটির জন্য ?

সেটা আমার ব্যাপার। আই ওয়ান্টেড হিম ডেড। নাউ আই ওয়ান্ট ইউ ডেড।

কেন ডেভিড ?

ইউ আর রাসক্যালস। ডাউনরাইট রাসক্যালস। দি হোল

সিভিলাইজড ওয়ার্ল্ড ইজ ফুল অফ রাসক্যালস। রাইট দি চেক।

ডেভিড, বাড়াবাড়ি কোরো না। তুমি জানো, আমি তোমাকে অনেক টাকা দিয়েছি। এত টাকা কেউ তোমাকে কখনও দেয়নি।

ইয়েস, আপনার নোংরা ঘাঁটার কাজের জন্য টাকা দিয়েছেন। আমি নেশা করি বলে টাকা নিতে বাধ্য হয়েছি। তাতে কি ? নাউ আই ওয়ান্ট টু এন্ড দি রিলেশন। রাইট দি চেক, ইট উইল বি দি ফাইনাল পেমেন্ট। দেয়ার উইল বি নো মোর ডেভিড অ্যান্ড নো মোর নাথিং।

বেশ, দিচ্ছি, কিন্তু গ্যারান্টি কী ?

নো গ্যারান্টি। শুধু মুখের কথা।

সর্বজিৎ গিয়ে সুটকেসটা খুলল। এবং রিভলভারটা তুলে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল, নাউ গেট আউট।

ডেভিড রিভলভারটা তাচ্ছিল্যের চোখে দেখল। একটু হেসে বলল, ট্রায়িং টু স্কেয়ার মি ? ইউ বাস্টার্ড—

সর্বজিৎ কোনও সময় পেল না। ট্রিগার টিপতে পারত। কিন্তু আঙুল বড় অবশ। চিতাবাঘের গতিতে ডেভিড এসে তার ওপর পড়ল। পরপর দুবার চপারটা চালাল ডেভিড।

দুটো হেঁচকি তোলার শব্দ করে মেঝেতে পড়ে গেল সর্বজিৎ। তারপর তার শরীর চমকাতে লাগল আহত সাপের মতো।

ডেভিড ভ্রূক্ষেপ করল না। সে সুটকেস খুলে ছুড়ে ফেলে দিতে লাগল কাপড়চোপড়। তলা থেকে এক বান্ডিল নোট পেয়ে পকেটে পুরে ফেলল সে। টেবিলের ওপর থেকে মানিব্যাগটাও নিল।

তারপর দরজা খুলল।

গুড মর্নিং ডেভিড।

ডেভিড একটু পিছিয়ে গেল। তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দুজন সিপাই ঘরে ঢুকে পড়ল। আহত সর্বজিতের দেহটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল তারা।

ডেভিড চেঁচাল, ইউ রাসক্যাল। বাস্টার্ড। কী করতে পারো তোমরা আমার ? কিছুই করতে পারো না। হ্যাং মি, শুট মি, কিপ মি ইন জেল, কিছুই যায় আসে না। আই অ্যাম বিয়ন্ড এভরিথিং। বিয়ন্ড এভরিথিং....

শবর করুণ চোখে চেয়ে রইল।

ডেভিড চিৎকার করতে লাগল, আই হেট ইউ। আই হেট ইউ অল। গো টু হেল বাস্টার্ডস। দুনিয়া গোল্লায় যাক। আমি তোমাদের সিভিলাইজেশনের মুখে পেচ্ছাপ করি....

চিৎকার করতে করতে ক্লান্ত অবসন্ন ডেভিড ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল।

শবর পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে চেয়ে থাকল শুধু।

—

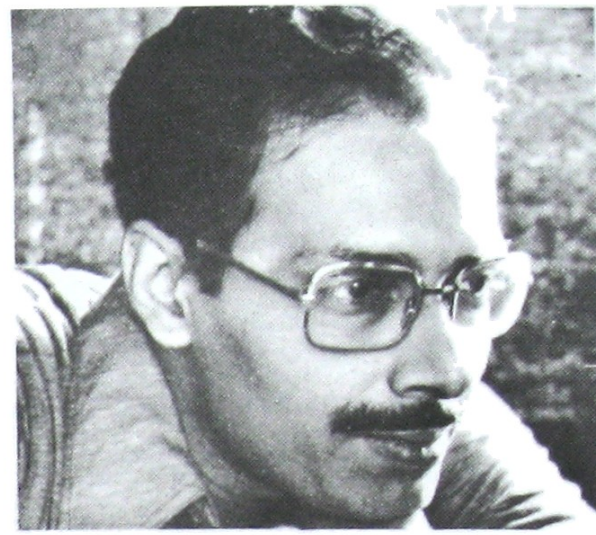

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ২ নভেম্বর, ১৯৩৫, ময়মনসিংহে। শৈশব কেটেছে নানা জায়গায়। পিতা রেলের চাকুরে। সেই সূত্রে এক যাযাবর জীবন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায়। এরপর বিহার, উত্তরবাংলা, পূর্ববাংলা, আসাম। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় কুচবিহার। মিশনারি স্কুল ও বোর্ডিং-এর জীবন। ভিকটোরিয়া কলেজ থেকে আই. এ.। কলকাতার কলেজ থেকে বি. এ.। স্নাতকোত্তর পড়াশুনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্কুল-শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। এখন বৃত্তি—সাংবাদিকতা। 'দেশ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।

ছাত্রজীবনের ম্যাগাজিনের গণ্ডি পেরিয়ে প্রথম গল্প—'দেশ' পত্রিকায়। প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা'। 'দেশ' শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত। প্রথম কিশোর উপন্যাস—'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'। কিশোর সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিরূপে ১৯৮৫ সালে পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার। এর আগে পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার। পরেও আরেকবার, 'দূরবীন'-এর জন্য।

'মানবজমিন' উপন্যাসে পেয়েছেন ১৯৮৯ সালের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার।

প্রচ্ছদ □ সুব্রত চৌধুরী